ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ।। ২৮ আষাঢ়, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৩ জুলাই, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

বামফ্রন্টের ভরাডুবির আশঙ্কা
রাজ্য ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত আমলারা

গূঢ়পুরুষ ।। কথায় আছে জাহাজ ডোবার আগে প্রথম পালায় জাহাজের ইঁদুরের দল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ভরাডুবি হতে চলেছে তা বুঝতে পেরে রাজ্যের আই এ এস-আই পি এস আমলার দল এখন রাজ্য ছেড়ে পালাতে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। এই আমলার দলই শিল্পায়ণের গালগল্প শুনিয়ে বুদ্ধদেববাবুদের পথে বসিয়েছে। সালিম-হালিম-টাটাদের হাত ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্য দফতরের সচিব সব্যসাচী সেন। ইনি সিঙ্গুরের কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে বিনি পয়সায় রতন টাটাদের দান করার রূপকার। সব্যসাচী সেনকে তাই গৌরী সেন নামেই এখন সকলে চেনে। সরকারি অর্থ নয়ছয় করে শিল্পায়ণ করার নীতিটি এই আই এ এস সচিবের। এই সব্যসাচী সেন দিল্লীতে খুঁটি ধরে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও একটি দফতরে যোগ দেওয়ার জন্য সকালে বিকেলে তদ্বির করছেন।

সব্যসাচী সেন

সব্যসাচী সেন ছাড়াও আর যে সব আই এ এস আমলা মহাকরণ ছেড়ে দিল্লী পালাতে ওভারটাইম খাটছেন তাঁরা হলেন পরিবহন দফতরের সচিব সুমন্ত্র চৌধুরী, বিদ্যুৎ সচিব সুনীল মিত্র, পুরসভা ও নগর উন্নয়ণ দফতরের সচিব পি কে প্রধান, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দফতরের সচিব এম এল মীনা, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত আই পি এস অফিসার এ কে মালিওয়াল, কৃষি সচিব সঞ্জীব চোপরা এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন। এরা সকলেই সরকারি নিয়ম নীতি মেনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রে বদলির আবেদন জানিয়েছেন। আবেদন জানালেই যে তাঁদের বদলি হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতর তাঁদের সার্ভিস রেকর্ড পর্যালোচনা করে মেরিটের ভিত্তিতে তাঁদের আবেদন বিবেচনা করবে। সেক্ষেত্রে তাঁদের আবেদন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পরিবহন, বিদ্যুৎ, কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে তাঁরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজ্যের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির দায়িত্বে আছেন এম এল মীনা। আয়লা ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত সুন্দরবনের মানুষকে রক্ষার সামান্যতম চেষ্টাও এই দফতর করেনি। এই দফতরের সচিব মশাই ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা পাওয়ার পর মহাকরণে দফায় দফায় যে সব মিটিং হয়েছিল সেখানে মুখ্যসচিব, মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীসহ সকলকেই বলেছিলেন, উদ্ধার ও ত্রাণের সব ব্যবস্থা একদম পাকা। বাস্তবে যখন আয়লা ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে তখন দেখা যায় মীনা সাহেবের দফতর ঝড়ে উড়ে গেছে। অসত্য বিবৃতি দিয়ে রাজ্যের মানুষ এবং প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দফতরের আমলাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেননি। এতটাই

(এরপর ৪ পাতায়)

স্বস্তিকা শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যার উন্মোচন করছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। (খবর ১৬ পাতায়)

জয়নগরে মুসলিম দুষ্কৃতীদের নগ্ন রূপ

সংবাদদাতা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসতের কাছে গোড়ের হাট। গত ২২ জুন সেখানকার পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলের উপর একশ্রেণীর মুসলিম দুষ্কৃতী হামলা চালায়। এই ঘটনায় আশপাশের হিন্দু গ্রামের মানুষ এখন যেমন আতঙ্কিত, সেইরকম ক্ষুব্ধ। এই বিদ্যালয়টি কতকগুলি হিন্দু গ্রামের মাঝে। অভিযোগ হল, ওই স্কুলের চারজন মুসলিম শিক্ষক নিজামউদ্দিন আহমেদ, তানিমুল আলম মোল্লা, মুজিবর রহমান এবং জিয়াউল হক হঠাৎ গ্রীষ্মের ছুটির আগে দাবী জানায় যে তাঁদের প্রতিদিন নামাজ পড়ার জন্য ৩য় কালাংশসহ ১ ঘন্টা ছাড়তে হবে। তাঁরা প্রধান শিক্ষক মনতোষ মন্ডল-এর কাছে এই মর্মে দরখাস্ত জমা দেন। সেইসঙ্গে আরও দাবী জানান যে স্কুলের উপরের একটি ঘরকে মসজিদের মতো ব্যবহার করতে দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক পরিচালন সমিতির সম্পাদককে এই দাবীর কথা জানান। এরপর তারা আরও দাবী করে যে, বিদ্যালয় হয়ে আসা সরস্বতী পূজাও বন্ধ করতে হবে। এতে হিন্দু ছাত্রদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষকদেরকে কিছু বলতে গেলে নিজামউদ্দিন ও তানিমুল তাদের মারতে শুরু করে। এতে উত্তেজনা বেড়ে যায়। সমস্ত হিন্দু ছাত্ররা এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। এদিকে এই ঘটনার সাথে সাথে ওই দু'জন শিক্ষক বিভিন্ন মুসলিম গ্রামের মসজিদে ও মাতব্বরদের কাছে অনবরত ফোন করতে থাকেন। অন্য হিন্দু শিক্ষকরা নিষেধ করলেও তাঁরা শোনেননি। কিছুক্ষণের মধ্যে ৫-৬ হাজার মুসলিম পাশাপাশি রামচন্দ্রপুর নন্দনপুর, হরিনারায়ণপুর, তালতলা, রায়নগর, মগরাহাট, বেনাপুর, কামরিয়া, ময়দা প্রভৃতি গ্রাম থেকে এসে প্রথমে বিদ্যালয়ে চড়াও হয়। ছাত্র, শিক্ষক সবাইকে মারতে শুরু করে। দরজা, জানালা থেকে সব কিছু ভাঙতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিম গাববেড়িয়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। বাঁধভাঙা বন্যার মতো পিল পিল করে ঢুকতে থাকা হাজার হাজার সশস্ত্র মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের সামনে দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। সবাই পালাবার চেষ্টা করে। যাদেরকে সামনে পায় তাদেরকেই মারে। কোনও ছাড় নেই। মহিলাদের চরমভাবে শ্লীলতাহানি করে। কঙ্কনা নামে আসন্ন প্রসবা এক গৃহবধূকে ধাক্কা মেরে পুকুরে ফেলে দেয়। কালিদাস হালদারকে ক্ষুর মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। স্বপন নস্করকে ইঁটের আঘাতে এমনভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় রেখে যায় যে স্থানীয় নার্সিংহোমে চিকিৎসার পর কোনওক্রমে বেঁচে যায়। রবীন্দ্রনাথ মন্ডলকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। তিনটি ক্লাব — উদয়ন সঙ্ঘ, জয় মা কালী ও বিনয়ী স্পোর্টিং-এর ঘর সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে। স্থানীয় গোপীনাথ মন্ডলের ঠাকুর বাড়িকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে।

অভিযোগ— মূল দুষ্কৃতীরা হল ওই চারজন এবং স্থানীয় বিভিন্ন কুকর্মের খলনায়ক বলে অভিযুক্ত সাজাহান মল্লিক (হরিনারায়ণপুর)। ওরই বড় ছেলে ছাদেক প্রমুখের নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটে। সব ঘটনাই প্রশাসন জানে। কিন্তু এসডিপিও, বিডিও এবং ওসি-র উপস্থিতিতে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি বৈঠকে সুরাহা কিছু মেলেনি। স্থানীয় বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুসা আলি মোল্লার ভূমিকা হিন্দু জনসাধারণকে বিস্মিত করে। ঘটনা হল, আবার শান্তি বৈঠক বসবে, নেতারা স্তোকবাক্য দেবে। প্রশাসন হিন্দুদের চুপ থাকার অনুরোধ করবে। কিন্তু এর শেষ কোথায় সেই প্রশ্নই জেগেছে তমাল, নিতাই, সুশান্তদের মতো স্থানীয় হিন্দু যুবকদের মনে।

আদবানীর পথেই জাতীয় পরিচয়পত্র
বিলির সিদ্ধান্ত চিদাম্বরমের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শেষ পর্যন্ত লালকৃষ্ণ আদবানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সারা দেশে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কাজ শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার। দ্বিতীয়বার সরকারে এসে প্রথম ১০০ দিনের কাজের মধ্যে দেশের সমস্ত নাগরিককে পরিচয় পত্র দেওয়ার প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। এজন্য অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এই পরিচয়পত্র দেওয়া হবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ স্থির করেছেন। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য বিখ্যাত তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসের কর্তা নন্দন নিলেকানিকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেশজুড়ে প্রকল্পটি রূপায়ণের স্বার্থে নিলেকানিকে ক্যাবিনেট মন্ত্রির সমান মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। বাজার থেকে উপযুক্ত মেধাকে নিয়ে এসে যাতে এই কাজে লাগানো যায় সেই স্বাধীনতাও দিয়েছে কেন্দ্র। এখন দেখার তিন বছরের সময় সীমার মধ্যে প্রকল্পটি শেষ হয় কিনা। কারণ, ২০১১ সালে দেশে জনগণনার কাজও চলবে। জনগণনার সময়ই যাতে নাগরিকত্ব দেখে পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শেষ করা যায় তা স্থির করেছে ইউপিএ সরকার। প্রসঙ্গত এন ডি এ আমলে তৎকালীন

নন্দন নিলেকানি

উপপ্রধানমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী সারা দেশে বহুমুখী জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পটি শুরু করেছিলেন। ১২টি রাজ্যের ৫০ এর উপর ব্লকে এটি শুরু করা হয়েছিল। এর মধ্যে পাকিস্তান, বাংলাদেশের সীমান্ত ব্লকও যেমন ছিল তেমনই মহানগরীর কাছাকাছি ব্লকও ছিল। দেখা গিয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তের ব্লকগুলিতেই হাজার হাজার মানুষ তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারেনি। এই পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের

(এরপর ৪ পাতায়)

বাজেটে গরীবদের জন্য শুধু কথাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ২০০৯-১০ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে গরীব মানুষের জন্য কার্যত কোনও পদক্ষেপ নেই। লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে দেশের দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী প্রতি পরিবারের জন্য ৩ টাকা করে ২৫ কেজি চাল অথবা গম দেবে। এজন্য এইসব পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিল আনা হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রণব মুখার্জীর বাজেটে সেই বিল কবে আনা হবে তার কোনও উল্লেখ নেই। ফলে চলতি আর্থিক বছরে দেশের বিপুল সংখ্যক গরীব-প্রান্তিক পরিবারগুলির কাছে সস্তার চাল-গম দূর অস্ত। আবার গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো অন্ত্যোদয় পরিবারগুলির জন্য বরাদ্দ খাদ্যশস্যে প্রতি কেজি পিছু ১ টাকা দাম বাড়ছে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিই সার। গরীবদের জন্য বাজেটে শুধু কথাই - কাজের কাজ কিছু নেই।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা

গ্রামের প্রতি নজর দেওয়াই বিকল্প ঃ ভাইয়াজী যোশী

গৌতম সরকার ।। "শত শত বছর ধরে গোরক্ষা এবং গরুকে ভিত্তি করে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা এদেশের সাধু-সন্ত এবং মহাত্মাদের স্বপ্নের বিষয়। এই স্বপ্নকে সর্বসাধারণ মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া এবং তাকে বাস্তবায়িত করাই বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। গত ২১ জুন ভূপালে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা-র সর্বভারতীয় কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরে এই কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী।

ভাষণরত ভাইয়াজী যোশী। মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) হুকুমচন্দ সাওলা, সীতারামজী প্রমুখ।

সারা দেশ থেকে বাছাই করা ২০০ জন কার্যকর্তা তিন দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযোশী উপস্থিত কর্মকর্তাদের বলেন, পরিবেশ রক্ষা, কৃষি ব্যবস্থায় সংস্কার, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ও পরম্পরার ধারা বজায় রাখবার জন্য গ্রামের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই একমাত্র বিকল্প। এজন্যই বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা। আমরা যদি তৃণমূল স্তরে দেশজুড়ে এক থেকে দু'লক্ষ কর্মী তৈরি করতে সক্ষম হই তাহলে সারা দেশে যে ১০০০টি উপযাত্রা বের হয়ে মূল যাত্রার সঙ্গে মিলবে তাও সফল হবে।

সর্বভারতীয় যাত্রার অন্যতম সংযোজক তথা আর এস এসের সর্বভারতীয় সেবা প্রমুখ সীতারামজী কেদিলাই যাত্রার সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করেন। আনন্দের বিষয় হল, ভারতের ৫ জন পূজনীয় শঙ্করাচার্যদের আশীর্বাদ এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। এই বৈঠকে দক্ষিণবঙ্গ থেকে শংকর মিত্র ও সনাতন মাহাতো এবং উত্তরবঙ্গ থেকে গৌতম সরকার অংশগ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই যাত্রা বিজয়া দশমী-২০০৯ কুরুক্ষেত্র থেকে শুরু হয়ে ১০৮ দিন পথ পরিক্রমা করে ২০১০-এ মকর সংক্রান্তিতে নাগপুরে সম্পন্ন হবে। এই মূল রথকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলায় জেলায় গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য উপরথ যাত্রাও হবে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার কেন্দ্রীয় সমিতির পদাধিকারী হুকুমচাঁদ সানলা, দিবাকর শাস্ত্রী, শংকরলাল আগরওয়াল, মেঘরাজ জৈন এবং ভঁওরলাল কোঠারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়

ঘন বিপদ

পি টি টি আই সমস্যা আবারও মাথা চাড়া দিচ্ছে। তিন বছর ধরে অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ুয়ারা। বার বার আন্দোলনেও সুফল মেলেনি। সরকারও জট খুলতে পারেনি। ইতিমধ্যেই অবসাদে ১১ জন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন। পি টি টি আই পড়ুয়ারা আবারও বড় ধরনের আন্দোলনের পথে নামতে চলেছেন। গোপন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এবার লাগাতার অনশন চালাবেন তাঁরা। যার পিছনে থাকছে খোদ বামপন্থী সংগঠন ওয়েস্টবেঙ্গল প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। ফলে বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যকে যে আবারও বেকায়দায় পড়তে হবে তা মোটামুটি পরিষ্কার।

খেলা

খেলা নাকি অন্য কিছু! সমগ্র বিশ্ব যখন জীব-জন্তুর রক্ষায় বদ্ধ পরিকর, সেখানে স্পেনের চিত্রটা অন্যরকম। হতাশাজনক। খেলার নামে প্রতি বছর চলে আসছে জন্তু নিধন। স্পেনে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ের খেলা। এতে দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্পেনবাসীরা ক্ষত সামলে উঠলেও, নিরীহ ষাঁড় মারা যায় বড় সংখ্যায়। কিন্তু আর না। স্পেনবাসীদের একাংশ এমন খেলার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারিভাবে এই খেলা বন্ধের দাবীও উঠেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কিন্তু আন্দোলনকারীরা তাদের আন্দোলনে অনড়।

ব্যর্থ রাজা

এখনও কোণঠাসা তিনি। তাঁর ইস্তফার দাবী উঠেছিল খোদ পলিটব্যুরোতে। মাঝে পরিস্থিতি কিছুটা হাল্কা হলেও, আবার বেকায়দায় পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি আর এস পি-র বৈঠকেও বুদ্ধদেবের পদত্যাগের দাবীতে সরব হন নেতারা। বৈঠকে সদ্য পুর নির্বাচনের ব্যর্থতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। দলের হেভিওয়েট নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা করেন। তাদের মতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যর্থতাই এর জন্য দায়ী।

হেল্প লাইন

র‍্যাগিং বিরোধী লড়াইয়ে হেল্প লাইন চালু করল কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং রোধে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যাবে এতে। ১৮০০-১৮০-৫৫২২ নম্বরে ফোন করে জানানো যাবে অভিযোগ। অভিযোগ জানানো হলে হেল্প লাইন থেকে একটি নাম্বার দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। এছাড়া helpline@antiragging.net -এ মেলও করা যাবে। ফোনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

অনুন্নয়ণ

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে বিরোধী শিবির বারবার তুলে ধরেছে লালগড়ের অনুন্নয়ণের চিত্র। অথচ সরকার ছিল মৌন। অবশেষে সরকারিভাবে মেনে নেওয়া হল লালগড়ের অনুন্নয়ণের কথা। খোদ স্বরাষ্ট্র সচিব অর্ধেন্দু সেন লালগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে একথা স্বীকার করেন। দীর্ঘ ৩২ বছরের শাসনে লালগড় বরাবরই উপেক্ষিত। 'লালগড় অপারেশন' কিছুনা হোক, রাজ্যের দৈন্য চিত্রকে সরকারিভাবে তুলে ধরেছে।

বিপদের আঁচ

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন মানেকা গান্ধী। ছেলে বরুণ গান্ধীর আশু বিপদের আঁচ পেয়েই চিঠি লেখেন তিনি। বরুণ গান্ধীর বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ছেলে বরুণকে প্রাণে মারতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীরা। মানেকা তাঁর চিঠিতে এমনই আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন। পিলিভিটের পর আবার যাতে কোনও বিপদের মুখে না পড়ে, সে কথা ভেবেই সতর্ক হয়ে উঠেছেন বিজেপি সাংসদ মানেকা।

গ্রামীণ মামলা

গ্রামের মানুষের কথা ভেবে প্রশাসনিকস্তরে নতুন পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে ছত্তিশগড় পুলিশ। গ্রামের মানুষ যাতে সহজেই প্রশাসনের সাহায্য পেতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই পরিকল্পনা। গ্রামের বহু মামলা দীর্ঘদিন পড়ে থাকলেও, সমাধান হয় না প্রশাসনিক গড়িমসিতে। কিন্তু আর না। স্থানীয় পুলিশ অফিসাররাই এবার সমাধান করবেন সেসব। রাজ্য পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা খবর নেবেন সে সব কেসের। ইতিমধ্যেই ৫৭টি কেসের মধ্যে ৫৪টি সমাধান করেছে পুলিশ। এই ব্যবস্থায় আশাবাদী খোদ অ্যাডিশনাল এস পি রাজনেশ সিং-ও।

ঠগ বাছতে

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় অবস্থা অসম পুলিশের। রাজ্য পুলিশের একটা বড় অংশই বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত। রাজ্যের ১৯০ জন পুলিশের বিরুদ্ধে ঝুলে রয়েছে বিভিন্ন মামলা। যার মধ্যে রয়েছে আই পি এস অফিসার রাঘবেন্দ্র অবস্থি, এপিএস অফিসার বিনয় কালিকাটা-র মতো প্রশাসনিক কর্ম - কর্তার নাম। এর মধ্যে অনেক মামলা ৫ বছরের বেশিও হয়ে গেছে। কোনও বিচার হয়নি। শুধু তাই নয়, তরুণ গগৈ সরকারের রাজত্বে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন থানায় সাড়ে ৩৬ হাজারের ওপর মামলা ঝুলছে। যেগুলি আদালত পর্যন্তও গড়ায়নি।

পশু কল্যাণ

ঘোড়ায় টানা গাড়ি উঠিয়ে দিতে চলেছে দিল্লী কর্পোরেশন। ইতিমধ্যেই এই মর্মে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ইতি-উতি ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা কম হলেও পশু কল্যাণের কথা ভেবে তা বন্ধ করতে চাইছে দিল্লী কর্পোরেশন। এই মুহূর্তে দিল্লীতে ২৫০টি টাঙ্গা চালু আছে। যার মধ্যে ২৩২টির লাইসেন্স রয়েছে। টাঙ্গা-চালকেরা যাতে বিকল্প ব্যবস্থায় উপার্জন করতে পারে কর্তৃপক্ষ সেই ব্যবস্থা করছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাজেট না রাজনৈতিক এজেন্ডা ?

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের দুইটি বাজেটই পেশ করা হইয়াছে। এই দুইটি বাজেটের মূল ভিত্তিই হইল রাজনৈতিক কার্যকারিতা — অর্থনৈতিক কার্যকারিতার ছিঁটে ফোঁটাও নাই। ইউ পি এ সরকারের নয়া দোসর তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হিসেবে তাঁহার রেল বাজেটে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে এই বাজেটের ভিত্তি অর্থনৈতিক কার্যকারিতা নয়, সামাজিক কার্যকারিতা। তাঁহার এই সামাজিক কার্যকারিতার আসল অর্থ রাজনৈতিক কার্যকারিতা। সেই কারণে তিনি তাঁহার বাজেটকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। যেখানে যেখানে খরচ করিলে রাজনৈতিক লাভ আছে, সেইসব ক্ষেত্রে তিনি কল্পতরু হইয়াছেন। আয়ের ব্যবস্থা না করিয়া তিনি দেদার ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন যে, এই বাজেট কেবলমাত্র এক বছরের আয়-ব্যয়ের কর্মসূচী। তিনি এমন সব প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন যেগুলির সময়সীমা পঞ্চ বার্ষিক কিংবা দশমবার্ষিক। তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন যে তিনি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা পেশ করিতেছেন না, পেশ করিতেছেন বাৎসরিক বাজেট। এই প্রকল্পগুলির জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে সেই চিন্তা নয়, তাঁহার কাছে বাজেট মানে কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেদার খরচ।

ইউ পি এ সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় একজন ঝানু রাজনীতিক। তিনি মমতার মতো স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই তাঁহার এই রাজনৈতিক কার্যকারিতা বা বাধ্যবাধকতার কথা। কিন্তু আদতে তিনিও যাহা করিয়াছেন, তাহা ওই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেরই চরিতার্থতা। এমনকী তাঁহারই প্রদত্ত আর্থিক সমীক্ষা যাহা তিনি মাত্র দুইদিন আগে সংসদে পেশ করিয়াছিলেন তাহারও ধার কাছ দিয়া যান নাই। সংস্কার কর্মসূচীর জয়ঢাক কেমন যেন হঠাৎই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কার করিতে কি তাহার সংস্কারে বাধিতেছে? রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার বেচিয়া বছরে ২৫,০০০ কোটি টাকা রোজগার করিবার পরিকল্পনা যাহার ছিল, মাত্র দুইদিন আগের সেই শেয়ার বিলগ্নীকরণের লক্ষ্য মাত্রা বাজেটে কেমন করিয়া কমিয়া দাঁড়াইল মাত্র ১,১২০ কোটি টাকায়।

সংস্কার কর্মসূচীর এই হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িবার কারণ কী? বামপন্থীরা এইবার ইউ পি এ-তে নাই। কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের বাধ্যবাধকতাও নাই। তাহা হইলে কোন্ জায়গা হইতে আসিল এই বাধা? পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ইউ পি এ সরকার গঠনের শুরু হইতেই ডি এম কে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বিলগ্নীকরণের বিরোধিতা করা হইয়াছিল। তাহা হইলে কী এইবার এক অলিখিত কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম তৈয়ার হইয়াছে? না কি এক অপ্রত্যাশিত জয়ের কারণে এইটি এক প্রত্যাশিত সতর্ক পদক্ষেপ?

খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার এখনই অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে কিছুতেই ঢালাও সংস্কারের পথে যাইবার পক্ষপাতি নয়। সংস্কারের পিচ্ছিল পথ তাই ইউ পি এ সরকার সযত্নে পরিহার করিয়াছে। অতএব বাজেটকে পরিণত করা হইয়াছে 'রাজনৈতিক এজেন্ডায়'। বাজেট আর আর্থিক সমীক্ষা নয়, রাজনৈতিক সমীক্ষা।

বাজেট যদি রাজনৈতিক কর্মসূচীতে পরিণত হয় তবে তাহার পরিণতি যাহা হইতে পারে তাহাই হইয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঢালাও খরচ করাই এইবার বাজেটের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মমতা যেমন পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঢালাও প্রকল্পের প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রণববাবুও ঠিক পশ্চিমবঙ্গের জন্য তেমনি ঢালাও প্রকল্পের প্রস্তাব করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্য দান খয়রাতির প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিবার জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে ও তামিলনাড়ুতে দুইটি হস্তচালিত তাঁত শিল্প তালুক গড়িয়া তুলিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই খাতে বরাদ্দ করিয়াছেন ৪০ কোটি টাকা। রাজ্যের চালু প্রকল্পগুলির জন্য গত আর্থিক বছরের তুলনায় বরাদ্দ বহুগুণ বাড়াইয়াছেন। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন ২৩১ কোটি টাকা। গত বছরে ছিল মাত্র ৬০ কোটি টাকা। এই রকম বহু খাতেই রাজ্যের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াইয়াছেন অর্থমন্ত্রী।

এছাড়াও ব্যাপক বরাদ্দ করিয়াছেন সর্বভারতীয় সামাজিক প্রকল্পগুলিতে, যেমন জে এন এন ইউ আর এম খাদে বরাদ্দ ৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি করিয়া ১২,৮৮৭ কোটি টাকায় দাঁড় করাইয়াছেন;এ পি ডি আর পি প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়াইয়াছেন ১৬০ শতাংশ অর্থাৎ ১০৮০ কোটি টাকা, এন এইচ এ আই প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়াইয়াছেন ২৩ শতাংশ, মুম্বাই ড্রেনেজ প্রকল্পে বরাদ্দ ২০০ কোটি হইতে বাড়াইয়া করিয়াছেন ৫০০ কোটি।

এই বিপুল ব্যয়ের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৪,০১,০০০ কোটি টাকা ঋণ লইয়া এই আর্থিক ঘাটতি মিটাইবার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করিয়াছে। এবারে ঘাটতি নাকি সর্বকালীন সর্বোচ্চ। জি ডি পি'র ৬-৮ শতাংশ। পূর্বে ইহা ছিল ২ শতাংশ। এই ঋণের অর্ধেক উঠানো হইবে বাজার হইতে আর অর্ধেক আসিবে নোট ছাপাইয়া। তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি কোথায় পৌঁছাইবে?

এইবার দেখা যাউক রাজস্বের অবস্থা। অর্থমন্ত্রী তাঁহার বাজেটে ৬.৮ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতির কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ টাকার অঙ্কে দাঁড়াইবে ২,৮২,৭৩৫ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ সালে এই ঘাটতির প্রস্তাব ছিল ৫৫,১৮৪ কোটি টাকা। কিন্তু বছর শেষে সেই ঘাটতি বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ২,৪১,২৭৩ কোটি টাকায়। এবারের প্রস্তাবিত ঘাটতি যে ২,৮২,৭৩৫ কোটি টাকায় আটকাইয়া থাকিবে না তাহা প্রায় নিশ্চিত করিয়াই বলা যায়।

জমির উপর জবরদস্তি

গোপীনাথ দে

সাধারণ ভাবে জমি বলতে আমরা বুঝি, যে ভূখণ্ডের ওপর কৃষিকর্ম হয় সেই ভূখণ্ডকেই আমরা জমি বলি। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ফুল, ফলের বাগান এমনকী পতিত ভূখণ্ডকেও ব্যাপক অর্থে জমি বলা হয়ে থাকে। তবে কোনটা কৃষিজমি, কোনটা অকৃষি জমি, কোনটা পতিত জমি, কোনটা বাগান ইত্যাদি সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে বামফ্রন্টের তৃতীয় ভূমিসংস্কার (১৯৮১) আইন। ওই আইনে বলা হয়েছে, আকাশের তলায় পশ্চিমবঙ্গের যে ভূখণ্ডই থাকুক না কেন সেটাই কৃষিজমি। হোক না সেটা বাস্তু-ডোবা, পুকুর, রাস্তা, বাঁশঝাড়, খামারবাড়ি ইত্যাদি। অর্থাৎ সবই কৃষিজমি। তাই যখন কোন নেতা বা নেত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে অকৃষি জমিতে কারখানা হোক; তখন মনে হয় আইনের চোখে তাঁরা ভুল বলছেন। কারণ, অকৃষি জমি বলে পশ্চিমবঙ্গে আইনত কিছু নাই। যদিও হাইকোর্টের রায়ে বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কারের ওই ফতোয়া 'আকাশের তলায় পশ্চিমবঙ্গের যে ভূখণ্ডই থাকুক না কেন সেটাই কৃষি জমি" নাকচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাইকোর্টের রায় কে মানছে! উলটে বরং বামফ্রন্টের ফতোয়া "বিচারকদের মাহিনা কিছু বাড়িয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সে যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কষিকর্ম হয় কতটুকু জমিতে? যতটুকু জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল ধান চাষ হয় প্রায় ৫৪ লক্ষ হেক্টর (এক হেক্টর সমান প্রায় সাড়ে সাত বিঘা) জমিতে। এবং ফল, সবজি, পাট ইত্যাদি চাষ হয় প্রায় আরও ১৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে। অল্প কিছু সংস্কার করে নিলে চাষ যোগ্য হয়ে উঠতে পারে এমন জমির পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ হেক্টর। সংস্কারের কাজটা ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু সে পথে বামফ্রন্ট এখনও এগোয়নি। এবং আরও ১৩ লক্ষ হেক্টর জমি আছে যেখানে মাটি নাই, পাথরে ঢাকা। যদিও এমন জমিকেও দূর দূর স্থান থেকে পলিমাটি লরি বোঝাই করে এনে পাথুরে মাটির ওপরে প্রায় তিনফুট মাটি বিছিয়ে সমতল করে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করে শস্য শ্যামলা করতে পেরেছে একমাত্র দেশ, তার নাম "ইসরায়েল"। আমাদের দেশে এভাবে পাথুরে ভূখণ্ডকে মাটি দিয়ে ঢেকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা কল্পনাতীত ব্যাপার। আমাদের প্রদেশে এমন পাথুরে মাটি, অনুর্বর এবং অকৃষি জমি রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, আসানসোল, বীরভূমের কিছু কিছু স্থানে। কৃষি জমি বৃদ্ধির যদি কোনও সুস্থ পরিকল্পনা সরকারের থাকত, তাহলে "ইসরায়েল"-এর পথ অনুসরণ করত।

অপরদিকে কৃষি জমির ওপর কী ভাবে চাপ বাড়ছে একটার পর একটা পর্যায়ে। সেগুলিও ভেবে দেখার মতো। যেমন--- পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ হাজার একর কৃষিজমির ওপর নতুন করে ঘর বাড়ি ও রাস্তা তৈরি হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা দূরে রেখে, উল্টে ওই ৫০ হাজার একর কৃষিজমি কমছে নূতন করে ঘর বাড়ি রাস্তা তৈরির ফলে।

আমাদের নিত্য খাদ্য তালিকায় সুষম খাদ্য রাখতে হবে অর্থাৎ খাদ্য তালিকায় ডিম, দুধ, মাংস বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য রাখতে হবে, তাই পশুপালন ও মৎস্যচাষ অপরিহার্য। তাই পশু ও মৎস্য চাষের জন্য পশু ও মাছকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। এই পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য বেশ কিছু জমি প্রয়োজন হচ্ছে এবং সেটা বর্তমানের কৃষি জমির একটা বড় অংশকে ধান-গম চাষ বন্ধ করে দিয়ে পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের প্রচলিত ও সহজলভ্য খাদ্য ধান-গম চাষের এলাকায় টান পড়ছে।

এর পরে বায়ো-ডিজেল উৎপাদনের জন্য ভ্যারান্ডা ইত্যাদি চাষ বাড়ার জন্যও বেশ কিছু চাষের জমি প্রয়োজন হবে। পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার নাকি সীমিত এবং নিকট ভবিষ্যতে পৃথিবীর পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার নাকি শেষ হয়ে যাবে। তখন পেট্রোল বা ডিজেল চালিত সব যানবাহন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই যতখানি সম্ভব খনিজ তেল কম ব্যবহার করে বায়ো-ডিজেল দিয়ে কাজ চালানো যায়, ততই নাকি ভালো বলে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। আর তাই বায়ো-ডিজেল পেতে হলে ব্যাপক হারে ভ্যারান্ডা বা ওই জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করতে হবে। অর্থাৎ ভ্যারান্ডা বা ওই জাতীয় উদ্ভিদের চাষের জন্যও বেশ কিছু চাষের জমি ছেড়ে দিতে হবে। প্রচলিত খাদ্য উৎপাদনের জন্য অর্থাৎ ধান-গম ইত্যাদি চাষের জমিতে টান পড়বে। নূতন করে চাষের জমি বাড়াবার দিকে নজর নেই, কিন্তু যেটুকু জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের যোগ্য আছে সেইটুকু জমির উপরেও নানা দিক থেকে ভাগ বসাবার ব্যবস্থা হয়ে চলেছে। সেই কারণে খাদ্যে স্বয়ম্ভর থাকা বা হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন চিহ্ন জেগে উঠছে।

কারখানা, বড় বড় ন্যাশনাল হাইওয়ে, নূতন রেলপথ যে অনেক কৃষি জমি খেয়ে নিতে পারে তাতো সকলেরই জানা, কিন্তু কৃষিজমি বৃদ্ধির কোনও কর্মসূচী কি রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকারের আছে কিনা তা চোখে পড়ছে না। দেশের অভ্যন্তরে কৃষি জমি বৃদ্ধির জন্য একটা উদাহরণ ইসরায়লে আছে। দেশের বাইরেও ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে — সে উদাহরণ আমরা চীনের কাছ থেকে নিতে পারি। বর্তমানে চীন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশের মধ্যে হাজার হাজর একর জমি লিজ নিয়ে চাষবাস করছে। এবং প্রয়োজনমতো ফসল চীন তার নিজের দেশে নিয়ে আসছে এবং বাকি অংশ বিশ্বের বাজারে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে।

আমরা জানি ব্রাজিলের প্রচুর চাষযোগ্য জমি পতিত হয়ে আছে। কিন্তু তারা সাদাচামড়ার মানুষ ছাড়া সেদেশের নাগরিকত্ব দেবে না এবং জমিও বিক্রি করবে না। কিন্তু কয়েক বছরের জন্য লিজে জমি চাষ করতে দেবে। তাই চীন সেই সুযোগ নিয়েছে। ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সে সুযোগ নিলে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও ওই লিজের মাধ্যমে চাষ পদ্ধতি লাভজনক হবে এবং দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক চাষও হতে পারে। আগামীদিনের বিপুল জনসংখ্যা ও গভীর খাদ্য সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে আগেভাগে ব্যবস্থা নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

> **"দেশের অভ্যন্তরে কৃষি জমি বৃদ্ধির জন্য একটা উদাহরণ ইসরায়লে আছে। দেশের বাইরেও ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে — সে উদাহরণ আমরা চীনের কাছ থেকে নিতে পারি। বর্তমানে চীন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশের মধ্যে হাজার হাজর একর জমি লিজ নিয়ে চাষবাস করছে।"**

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা ।। গত ৬ ও ৭ জুন হিমাচল প্রদেশের 'কুলু'তে "স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ "-এর জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠক হয়ে গেল। ওই বৈঠকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৯৬ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিলেন তিন জন। ৬ জুন সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বৈঠকের শুভ উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বভারতীয় প্রচারক প্রমুখ মদনদাসজী ও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সর্বভারতীয় সংযোজক অরুণ ওঝা। এছাড়া ছিলেন সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক কাশ্মীরিলালজী, ডঃ মহেশ শর্মা, মুরলীধর রাও, সরোজ মিত্র, কুমারস্বামী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

স্বদেশী প্রকাশন প্রকল্প, পরিবার সংস্কার প্রকল্প, স্বদেশী চিকিৎসা প্রকল্প, ভারতীয় রোজগার প্রকল্প, স্বদেশী মেলা প্রভৃতি কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করেন রচনাত্মক প্রকল্প প্রমুখ শ্রী লালজী প্যাটেল।

৬ জুন বিকালে প্রকাশ্য সমাবেশে স্থানীয় কর্মী ও বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়— (১) বিশ্ব মূলধনী সংকট থেকে ভারতের শিক্ষা গ্রহণ, (২) আর্থিক সংশোধনে ভারত সরকারের কাছে প্রত্যাশা, (৩) জেনেভায় সপ্তম ডব্লু. টি. ও-র মন্ত্রীস্তরীয় সম্মেলনে স্বদেশী এজেন্ডা পেশ।

মমতার রেল বাজেট— মিশন মহাকরণ ২০১১

।। তারক সাহা ।।

সেই Tradition সমানে চলেছে। অতীতে মাধবরাও সিন্ধিয়া থেকে মমতা পর্যন্ত যাঁরাই রেলমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁরাই নিজের নিজের রাজ্যে রেলের বরাদ্দ বা যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছেন। আসলে আমাদের দেশে সর্বভারতীয় রাজনেতার আকাল চলছে। এই রাজ্যে সিপিএমের বত্রিশ বছরের অপশাসনের ফলে বাংলার জনমানসে তৃণমূল তথা মমতার রমরমা। এই রমরমা বাজারে ফয়দা লুটতে স্বভাবতই রেলকে হাতিয়ার করেছেন মমতা — লক্ষ্য হল ২০১১-র 'মিশন মহাকরণ'।

এই মিশন মহাকরণ যাত্রার শুরুতেই মমতা যেন কামধেনু। টাকার সংস্থান নেই এমন আওয়াজ সর্বস্ব এই বাজেট কতটা তাৎপর্যপূর্ণ হবে তা বছর ঘুরলেই বোঝা যাবে। আসলে 'প্রকল্প' কথাটার মধ্যে 'কল্পনা' কথাটা লুকিয়ে আছে। 'কল্পনা'-টা কতটা বাস্তবায়িত হয় সেটাই লক্ষ্য করবে রাজ্যের জনতা। ঢালাও প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এই বাজেটে এ রাজ্যের জন্য কী নেই? নতুন ট্রেন থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্র, 'দুরন্ত ট্রেন' থেকে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। বাজেট দেখে মনে হচ্ছে অর্থমন্ত্রী প্রণববাবু তাঁর বাজেটের কিছু অংশ মমতাকে দিয়ে পাঠ করিয়ে নিয়েছেন। মনমোহন পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছেন মমতাকে। গত পাঁচ বছরে মনমোহন ধীরে ধীরে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ হয়ে উঠেছেন। তিনি জানেন এত প্রকল্পের টাকার সংস্থান নেই বাজেটে। মানুষের স্মৃতি খুবই কমজোরি। আগামী দু'বছর দেখতে দেখতে চলে যাবে। রাজ্যে দিশাহারা সিপিএমকে হারিয়ে যদি সম্ভব হয় তবে মমতার কাঁধে চেপে দীর্ঘ ৩৫ বছর পরে বাংলার মসনদে বসার একটা সুযোগ পাবে কংগ্রেস। যেমন গত পাঁচ বছরে লালুর প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ হল বা না হল তার হিসেব আজ আমজনতার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, ঠিক তেমনটাই হবে মমতার বেলাতেও।

মিশন মহাকরণ — ২০১১-র জন্য মমতা কী কী করলেন এই রাজ্যের জন্য! রাজ্যের প্রায় অর্ধেক ভোটার যুবক-যুবতী। তাদের জন্য মেট্রোয় ৬০ শতাংশ ছাড়। তরুণদের প্রলুব্ধ করতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 'যুবা ট্রেন' একেবারেই অর্থহীন। এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেন কোথাকার জন্য — শহরতলী নাকি দূরপাল্লার— বাজেট প্রস্তাবে তার উল্লেখ নেই। হাওড়া-শিয়ালদায় এই দুই বিভাগে বারো বগির ট্রেন চালু হলে আরেকটা বগি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা যেত। কারণ ট্রেনে এত মহিলা যাতায়াত করে না যাতে পুরো একটা ট্রেন সংরক্ষিত করা যায়। ভুগতে হবে সাধারণ পুরুষ যাত্রীদের।

রেল সূত্রের খবর, এযাবৎ অর্থের অভাবে বিভিন্ন রেলমন্ত্রীর ২০০-রও বেশি প্রকল্প রূপায়িত হয়নি। যেটা হয়ে থাকে তা হল ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি। দেশজুড়ে রেল ট্র্যাকের যে অবস্থা তাতে নন্ স্টপ ট্রেন চালানো খুবই মুশকিল এমনটাই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। মমতার নিজের আর্থিক ধ্যান-ধারণা সিপিএমের কাছাকাছি — অর্থাৎ সংস্কার বিরোধী। কিন্তু এবারের বাজেটে পরতে পরতে সংস্কারের কথা রয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে হাসপাতাল, নার্সিং কলেজের কথা রয়েছে বাজেটে।

এবার মমতা রেলমন্ত্রী হয়েছেন দুটো কারণে। প্রথম কারণ হল দীর্ঘ ৩২ বছর পরে মমতার দৌলতে সি পি এমকে পর্যুদস্ত করে এ রাজ্যে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে কংগ্রেস। তাই রেলের মতো দপ্তরের গুরুদায়িত্ব দিতে পিছপা হননি সোনিয়া। সবচেয়ে বড় এবং প্রধান কারণ হল রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতার অভিজ্ঞতা। এন ডি এ জমানায় বাজপেয়ী অনভিজ্ঞ মমতাকে যেভাবে রেলমন্ত্রী করেছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত মমতার বিজেপি তথা এন ডি এ-র কাছে। রেলমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা না থাকলে সোনিয়া এবারে মমতাকে রেলমন্ত্রী করতেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয়ত, জমি ব্যাঙ্ক গড়ার ধারণা কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে ধার করা। গুজরাটে যে কোনও শিল্প প্রকল্পের জন্য চটজলদি জমি পাওয়া যায়, তার কারণ হল সেখানকার সরকার জমি ব্যাঙ্ক তৈরি করেছেন। তাই তো ন্যানো এ রাজ্য থেকে চলে গেলেও মোদীর রাজ্যে জমি পেতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি রতন টাটার।

এরাজ্যে নতুন হাসপাতাল, বিদ্যুৎকেন্দ্র কেন্দ্র গড়তে গেলে জমি চাই। সেই জমি আসবে কোথা থেকে? মমতা যদি জমি অধিগ্রহণ করতে চায় তবে কি সি পি এম চুপ করে বসে থাকবে? যে ইস্যু নিয়ে মমতার বাজার এত সরগরম, সেই একই ইস্যুতে মমতা যদি জমি অধিগ্রহণে রাস্তায় নামেন তবে সিপিএম যে চুপ করে বসে থাকবে না এটা জলের মতো স্বচ্ছ। অবশ্য বলা হচ্ছে, জমি নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না — সব জমিই রেলের। কতগুলি প্রস্তাব অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। যেমন কাঁচরাপাড়ায় রেল কোচ নির্মাণ কারখানা। এতদিন ই এম ইউ কোচ বা মেট্রোর কোচ আসত চেন্নাই থেকে। শিল্প মরত, পিছিয়ে পড়া এই রাজ্যে এমন প্রস্তাব কর্মসংস্থান বাড়াবে। স্বাধীনতার পর চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার পর আর কোনও বড় প্রস্তাব এ রাজ্যে আসেনি। তার বড় কারণ হল আঞ্চলিকতাবাদ। ডানকুনি পর্যন্ত ফ্রেট করিডর সম্প্রসারণ করাকে সাধুবাদ জানিয়েছে শিল্পমহল। অবশ্য এটা কোনও নতুন প্রস্তাব নয়। লালুপ্রসাদ গত বাজেটেই এই প্রস্তাব রেখেছিলেন।

১৫০০ টাকার কম আয় অসংগঠিত ক্ষেত্রের এমন শ্রমিকদের ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত রেলযাত্রায় ২৫ টাকায় মাসিক টিকিট। এমন প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হলেও প্রশ্ন থেকে যায়। এক্ষেত্রে দলবাজি হবে না তো? কারণ এমন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণের দায় বর্তাবে জনপ্রতিনিধিদের উপর। প্রকৃত মানুষ বা দলমত নির্বিশেষে এই সুযোগ পৌঁছলে ভাল। তবে এবারের বাজেট প্রস্তাবে সিপিএমের মুখে টুঁ শব্দটি নেই। এতদিন ন্যানো নিয়ে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম মমতাকে শিল্প বিরোধী বলে যেভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছে, নির্বাচনের আগে দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি, ছড়া দিয়ে যেভাবে বিদ্রুপ করেছে তার যোগ্য জবাব এবারের রেল বাজেট। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রস্তাবগুলি রূপায়িত হলে বিধান রায়ের পর মমতাই হবেন এই রাজ্যে শিল্প বন্ধু। এরাজ্যের প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি : —

১। কাঁচরাপাড়ায় ই এম ইউ কোচ কারখানা। ২। আদ্রায় হাজার মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র। ৩। ডানকুনিতে লোকো কারখানা। ৪। নোয়াপাড়ায় কোচ মেরামতি কারখানা। ৫। মাঝেরহাটে ওয়াগন কারখানা। ৬। কলকাতায় নার্সিং কলেজ। ৭। বসুমতী অধিগ্রহণ প্রস্তাব, ৮। বারাসত, খড়গপুর, কলকাতায় মেডিকেল কলেজ। ৯। ডানকুনিতে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

প্রশ্ন হচ্ছে, উপরের প্রকল্পগুলি ২০১১ সাল অবধি রূপায়িত হবে তো? নাকি রাজ্যের প্রকল্পগুলি 'কল্পনার' আবর্তে আটকে যাবে?

রাজ্য ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত আমলারা

(১ পাতার পর)

অপদার্থ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

এই আমলারা ভালভাবেই জানেন যে মেরিটের ভিত্তিতে তাঁদের কেন্দ্রে পোস্টিং পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁরা অনেকেই এখন গোপনে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মন্ত্রী ও সাংসদের পায়ে তেল দিচ্ছেন। এই একটি ব্যাপারে এইসব আমলাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ণ নিগমের আই এ এস আমলা মনোজ পন্থকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব পদে বহাল করতে চান। বুদ্ধ দেববাবু এই অনুরোধ মেনে নিয়েছেন।

প্রণববাবু যখন মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার নির্বাচিত হন তখন মনোজ পন্থ ছিলেন সেখানের জেলাশাসক। নির্বাচনে প্রণববাবুকে জেতাতে তিনি তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। যেহেতু তখন প্রণববাবুর সঙ্গে সি পি এমের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাই মনোজ পন্থের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কড়া ব্যবস্থা নেয়নি। তাঁকে গুরুত্বহীন দফতরে বদলি করে দায় সেরেছিল। মনোজ পন্থ সেদিন থেকেই প্রণববাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। এতকাল পরে তাঁর প্রণব ভজনার ফললাভ হয়েছে। কমপক্ষে ছয়জন সিনিয়ার আই এ এস-কে টপকে তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব পদটি বাগিয়ে নিয়েছেন।

জানা গেছে যে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌগত রায় ছাড়া রাজ্য থেকে যাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা সকলেই জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্যক্তিগত সচিব পদে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আই এ এস অফিসারদেরই চান। বুঝতে অসুবিধা নেই যে পালাতে চাওয়া আমলাদের তৈল মর্দনই তৃণমূল মন্ত্রীদের খুশি করেছে। তা না হলে মেরিটের ভিত্তিতে দক্ষ আই এ এস আমলার পরিবর্তে তৃণমূল মন্ত্রীরা রাজ্যের অদক্ষ আমলাদের চাইতেন না। একদা সিপিএমের আস্থাভাজন এইসব আমলারা তৃণমূল শিবিরে ঢুকে পড়ছেন। এরপর তৃণমূল নেত্রী কী বলেন সেটাই দেখার।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম বাদে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সম্ভাবনা প্রবল

নিশাকর সোম

এই কলামে লেখা হয়েছিল — সিপিএম-এর কোমর ভেঙে গেছে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। সেটার প্রমাণ আর একবার হল পুরসভা নির্বাচনে। নির্বাচনে সিপিএম ধসে গেছে, ৩০ বছর রাজত্ব করা পুরসভা হাতছাড়া হয়েছে। বস্তুত সিপিএম-এর সংগঠনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস মৃত, নিস্ক্রিয়তার মরচে ধরে গেছে। তাই দেখা যাচ্ছে যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর পিছু পিছু পার্টি মাও-অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করছে। পার্টির উপর থেকে এই রোগ নিচের তলায় যাচ্ছে। এর কারণ হল ৩২ বছর ধরে পুলিশ প্রশাসনই সিপিএম-এর একমাত্র ভরসা, অবলম্বন, ধ্যান-জ্ঞান। তার ফলেই এই বিপর্যয়। আদতে দেশের ঐতিহ্য — ধর্ম-পরম্পরা বিচার-বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক দিশা ঠিক করতে ব্যর্থ হবে যে দল, সে-দলের ধ্বংস অনিবার্য। শুধু ম্যান-ম্যানি-মাস্‌ল দিয়ে সাময়িক লাভ করা যায়, কিন্তু শেষ অবধি তা টেকে না, টেঁকেনি সিপিএম-এর ক্ষেত্রে।

সাম্প্রতিককালে শেষ হওয়া সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর পরাজয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। সেখানে পলিটব্যুরোর তরফে যে ২৮ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তার ১১, ১২, ১৩, ১৪ পৃষ্ঠায় ভোটের সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে লেখা হয়েছে, মাত্র ৯৯টি বিধানসভা আসনে পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এরমধ্যে ৪১টি আসনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫টি বিধানসভা কেন্দ্র বিরোধীদের হাতে গেছে। এই রিপোর্টের ২৯ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে — রাজ্যপার্টি পরিচালিত সরকারের ব্যর্থতা কৃষি, সর্বশিক্ষা অভিযান, জনস্বাস্থ্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, বিপিএল তালিকা, রেশন কার্ড বন্টনে (উল্লেখ্য, কোনও কোনও এলাকায় লোকসংখ্যা থেকে বেশি রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে — অথচ রেশন কার্ড না পাওয়া ব্যক্তিগণও আছেন) কারচুপি। সড়ক, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতিতে কাজ না করা, পরন্তু এইসব কাজ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া-নদীয়াতে জমি-হারানোর আতঙ্কের ফলে পার্টির শোচনীয় পরাজয় হয়েছে।

পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করে তৃতীয় ফ্রন্টের স্লোগানের জন্য হার — এটা একটা অজুহাত মাত্র। আসলে রাজ্য পার্টি নেতৃত্ব পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ত্রিপুরাতে শক্তি ধরে রাখার জন্য ত্রিপুরা পার্টিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে অন্য রাজ্যের সকল সদস্যই বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে পার্টি দেশের বাম আন্দোলনের সর্বনাশ করে দিল। এ প্রসঙ্গে পলিটব্যুরোর সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, পলিটব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে পার্টিকে "চরে খাও", করতে দিয়েছিল। পি বি বুদ্ধদেববাবু ও নিরুপম সেনের কথাকে গসপেল ট্রুথ (বেদবাক্য)বলে গ্রহণ করেছিল। অন্য রাজ্যের সদস্যগণ এমনও বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের নেতারা রাজ্যে ফিরে যান এবং নিজেদের হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। বস্তুত বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয়-শ্যামলরা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সামনে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছেন। তাঁদের আর মুখ দেখানোর জায়গা নেই।

তৃণমূলীদের জয়োল্লাস।

ঠিক এর পরেই রাজ্য বামফ্রন্টের সভায় বলা হয়েছে — সিপিএম-এর নেতৃত্বের জন্য মন্ত্রিসভা এবং রাজ্যের বাম আন্দোলন কলুষিত হয়েছে।

সিপিআই দলের ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের সভাতে বলা হয়েছে রাজ্যের জমি নীতি, শ্রম নীতি ও জনপরিষেবার জন্য পরাজয় হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, রাজ্যের বামফ্রন্ট কাগজেই আছে। বস্তুত সিপিএম-এর একদলীয় শাসন চলছে। প্রসঙ্গত সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন দূরদর্শনের এক বেসরকারি চ্যানেলে বলেছেন — সি পি এম কোয়ালিশন ধর্ম মানে না, একদলীয় স্বেচ্ছামূলক কাজ করে চলেছে — সিপিএম-এর উপর থেকে তলা পর্যন্ত অহঙ্কার ঔদ্ধত্য দেখা যাচ্ছে। এ রোগ দূর করতে ওপর ওপর রঙ করলে চলবে না, খোল নলচে বদলাতেও হবে। কাজের পদ্ধতির আমূল বদল করতে হবে। বর্ধন আরও বলেছেন ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার সিপিএম-এর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত রয়েছে। এমনকী তিনি বলেছেন, সিপিআই নেতাদের মধ্যেও অহঙ্কার ঔদ্ধত্য দেখা গেছে।

বর্ধনের কথাগুলি উদ্ধৃত করলাম এ কারণে যে, এই কথাগুলি স্বস্তিকার এই কলামে এবং অন্যান্য লেখায় বহু পূর্বেই লেখা হয়েছিল। আজ তা সত্য বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

পুরসভার নির্বাচনী ফলাফল থেকে দেখা গেল সিপিএম-এর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং পুর-পরিষেবা না-দেওয়ার সত্যতা।

লালগড়, মাওবাদী ও সংশোধিত আইন নিয়ে বুদ্ধবাবুরা ল্যাজে-গোবরে হয়েছেন। সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বারংবার মাওবাদীদের নিষিদ্ধকরণ এবং বিশেষ আইন প্রয়োগে বিরত থাকতে বলেছিলেন। বুদ্ধবাবু শোনেননি। এখন বামফ্রন্টে সিপিএম কোণঠাসা। বামফ্রন্টে সিপিআই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক তো আগেই সিপিএম বিরোধী ছিল। এখন এর সঙ্গে কিরণময় নন্দ, প্রতীম চ্যাটার্জিরাও যোগ দিলেন। মন্ত্রিসভার কোর কমিটিতে ক্ষিতি গোস্বামী এবং নন্দ ভট্টাচার্য বলেছেন, "বুদ্ধবাবু একলা কেন জেলা সফরে যাবেন, আমরাও যাব।" কোর কমিটিতেও বুদ্ধবাবুরা নিঃসঙ্গ।

কেন এমন হল? কারণটা খুবই স্পষ্ট-সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষীর সরটা লুটেপুটে খাব আর তার নিয়ম মানবো না তা তো হতে পারে না। কোয়ালিশন ধর্ম সিপিএম পালন করেনি। যেটা এন ডি এ তাদের মন্ত্রিসভার মেয়াদ কালে দেখিয়ে দিয়েছিল।

পুরসভার নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সিপিএম-এর অভ্যন্তরে তীব্র কলহ শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক ডাঃ শৈলেন দাসের হত্যাকারীদের সঙ্গে নির্বাচনী গাঁটছাড়া বেঁধে সিপিএম-এর মুখে চুনকালি পড়েছে। দমদম, দক্ষিণ দমদম, উলুবেড়িয়া, মহেশতলা প্রভৃতি পুরসভাতে প্রায় তিন দশক ক্ষমতায় থাকার পর পরাজয়টা কেন? নিচের তলায় প্রমোটারদের থেকে পয়সা খাওয়া, জোর-জবরদস্তি করে টাকা আদায়, পুরসভার ঠিকাদারী পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে "হিস্যা" নেওয়া — এইসব কারণগুলি তো আছেই।

ইতিমধ্যে সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্ব মন্ত্রিত্বের পরিবর্তনের কথা উঠেছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা রাজ্য কমিটির সদস্য রেজ্জাক

(এরপর ৭ পাতায়)

অন্য রকম

নেশাহীন গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। তারা বিড়ি কি জানে না। তাদের জানা নেই সিগারেট কত প্রকার। অত্যাধুনিক নেশার দ্রব্যগুলিও ওদের অজানা। চোখেই দেখেনি ওসব। সাত থেকে সত্তর — সকলের কাছেই 'নেশা' শব্দটা যেন অভিধান বহির্ভূত। এই চিত্র মঙ্গল গ্রহের নয়। চিত্রটা এই গ্রহের। পৃথিবীর। উত্তরপ্রদেশের মিরাগপুর। মিরাগপুরের অধিবাসীরা নেশার সঙ্গে পরিচিত নয়। এই গ্রামে আজও পাঁচ হাজার, গুটখা, তেরঙ্গা, সাতাশ সাতাত্তরের মতো নেশাদ্রব্যের প্রবেশ ঘটেনি। বছরের পর বছর এই রীতিই চলে আসছে। গ্রামের মানুষ স্বপ্নেও ভাবে না, গ্রামের কোনও মানুষ নেশা করতে পারে। শুধু নেশা নয়, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে এমনই বিধি -নিষেধ। মিরাগপুরে মাছ-মাংস ঢোকে না। কচি-কাঁচারা পাঠ্য পুস্তকে পিঁয়াজ, রসুনের নাম শুনেছে। কিন্তু চোখে দেখেনি। রান্না-বান্না খাঁটি নিরামিষ। দিল্লী থেকে ১২০ কিমি দূরের এমন গ্রাম চোখে না দেখলে বোঝা যায় না, এমনও হতে পারে এই ভূ-ভারতে।

সাতের দশকে — গ্রামে কোনও এক কারণে এসে পড়েন বাবা ফকির দাস। ফকির দাসের অন্যতম বাণী ছিল যৌবন, স্বাস্থ্য, নদীর জল, আকাশের মেঘ কখনও এক থাকে না। নিজেদের স্বাস্থ্যর দিকে তাকিয়েই ফকির দাসের উপদেশ মেনেই গ্রামবাসীরা নেশা না করা, নিরামিষ ভোজনের রীতি চালু করে। বাবা ফকির দাসের পরলোক গমনের পর গ্রামবাসীরা আশ্রমও বানিয়েছে গ্রামে। সেই সঙ্গে এই রীতিরও চালু সেই থেকে।

গ্রামের ধারে কাছে কোনও দোকান নেশার সামগ্রী বিক্রি করে না। গ্রামের কিছু সম্প্রদায় রীতি-নীতি মানতে না চাইলেও, দীর্ঘদিনের রীতির প্রতি সম্মান জানাতে তারাও এনিয়ে কোন্দল করে না। ২০০৯ সাল। এই রীতি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। গ্রামের মানুষ এই বিশ্বাসেই বিশ্বাসী।

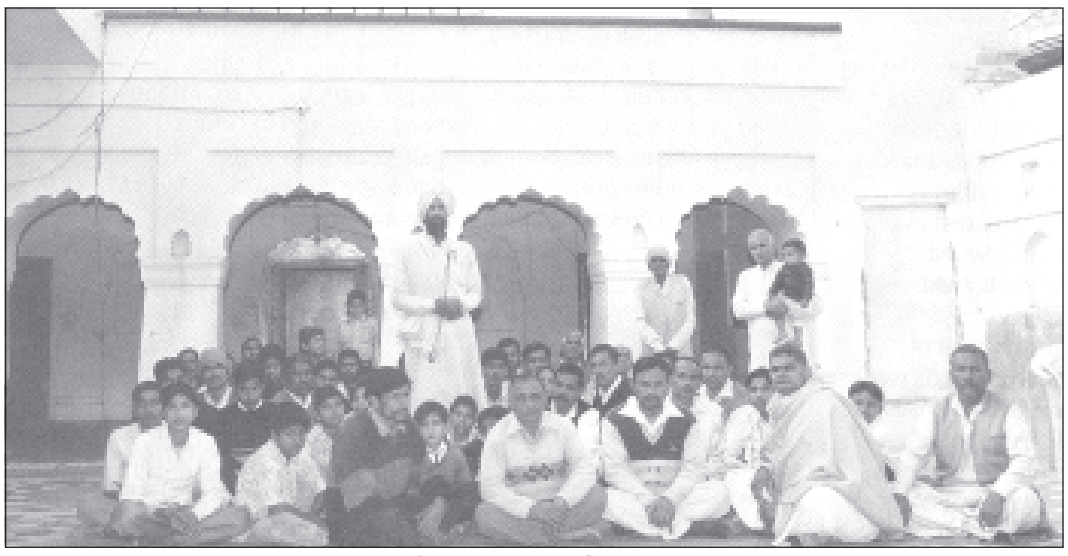

উত্তরপ্রদেশের মিরাগপুর— নেশাহীন গ্রামের মানুষজন।

রাষ্ট্রপতির দরবারে মহিলা সুরক্ষা মঞ্চ (অসম)-এর প্রতিনিধি দল

সংবাদদাতা ।। গত ২৬ জুন রাষ্ট্রপতি ভবেন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিলের সঙ্গে মহিলা সুরক্ষা মঞ্চ (অসম) সাক্ষাৎ করতে যান। এই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন সুনীতা হলদেকর, ডঃ শরদ রেণু, শ্রীমতী আশা শর্মা, শ্রীমতী বিজয়া চক্রবর্তী (সাংসদ, গুয়াহাটী) লোকসভার বিরোধী দলের সহনেত্রী সুষমা স্বরাজ। শ্রীমতী স্বরাজ বলেন, N.C. Hills (উত্তর কাছাড়) জেলায় ডিমাসা এবং জেমি নাগারা পরস্পর সদ্‌ভাবের সঙ্গে বসবাস করে আসছে। গত চারমাস থেকে এই এলাকা অমানবিক হিংসায় অশান্ত হয়ে উঠেছে। যে কোনও হিংসাত্মক ঘটনায় সেখানকার মহিলা এবং শিশুরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেখানকার পরিস্থিতির কথা রাজ্য সরকার এবং রাজ্যপালকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। মহিলা সুরক্ষা মঞ্চের বোনেরা দেশের সর্বোচ্চ অধিকারীর কাছে জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্বাস্তু ডিমাসাদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন সুনীতা হলদেকর।

শ্রীমতী হলদেকর বলেন, বিগত চার মাস ধরে চলা এই পরিস্থিতিতে N. C. Hills জেলার সমস্ত পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত ডিমাসা, জেমি নাগা জনজাতিরা হিংসার কারণে নিজেদের ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, শতাধিক ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে; বহু ব্যক্তির হত্যা হয়েছে, দশ হাজারের বেশি জনজাতিরা ১৩টি শিবিরে অসহ্য জীবন-যাপন করছেন।

গত ১৬ জুন হরক্কা ধর্মের ধর্মগুরুসহ তার পরিবারদের ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

অসমের প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারী জে পি রাজখোয়া সেন্টিনেল পত্রিকায় ৭ জুন প্রকাশিত লেখায় স্পষ্ট বলেছেন, এই ঘটনার পিছনে চার্চের হাত আছে। আমাদেরই মূল সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত জনজাতি বন্ধুরা সন্ত্রাসবাদী সেজে জেমি নাগা এবং ডিমাসা বন্ধুদের উপর আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে।

ডঃ শরদ রেণু বলেন, চার মাস থেকে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা অসমে চলছে, তা সত্ত্বেও রাজ্যস্তরে এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে নিউজ এজেন্সী এই মারাত্মক বিষয়ে নীরব। রাষ্ট্রপতি সমস্ত বিষয় শুনে সুরক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

নকল ধানবীজ নিয়ে চাষীরা উদ্বিগ্ন

উত্তর দিনাজপুর

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা শহরের বাজারে নকল ধান বীজ আসায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। সম্প্রতি আমন ধানের বীজতলা (চারা) তৈরীর কাজ শু(হয়েছে। এই অবস্থায় ধানের বীজ নির্বাচন নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন চাষীরা। মহকুমা কৃষি দপ্তরের প(থেকে নিয়মিতভাবে বীজের দোকানগুলিতে তল্লাসী চালিয়ে সম্প্রতি ১৮৬ বস্তা নকল ধান বীজ উদ্ধার করেছে। মহকুমা কৃষি আধিকারিক পারমিতা বি(াস জানান যে, নকল সার্টিফিকেটের লেবেলযুক্ত(ধান বীজের উৎসের সন্ধানে তদন্ত চলছে।

এক বিশেষ সূত্রে জানা গেছে যে, বেশ কিছু অসাধু বীজ ব্যবসায়ী বাজার থেকে চাষীদের উৎপাদিত ধান কিনে এনে মজুত করেন। তারপর মরশুম শু(র সময় যে কোনও স্বীকৃত নামি কোম্পানীর জাল লেবেল বীজভর্তি বস্তায় লাগিয়ে বেশি মুনাফা কমানোর জন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা তা বাজারে ছাড়ে বলে প্রকাশ। সাধারণত আসল সার্টিফায়েড ধান বীজের বস্তার সঙ্গে নকল ধান বীজের বস্তার পার্থক্য বুঝতে পারা যায় না। আর এইভাবেই চাষীরা অসাধু ব্যবসায়ীদের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বসান্ত হচ্ছেন। একদিকে যেমন নকল বীজ ব্যবহার করে চাষীরা তাদের আশানুরূপ ফলন পান না, অন্যদিকে তেমনি চাষীরা আর্থিক দিক দিয়েও (তিগ্রস্ত হচ্ছেন। নিয়ামতপুরের এক ধানচাষী মাধব সরকার বলেন যে, ১৫ বিঘা জমিতে ধান চাষ করার জন্য বাজার থেকে সার্টিফায়েড বীজ কিনে এনে বীজ তলা ফেলেছি। কিন্তু জানিনা ওটা আসল সার্টিফায়েড কিনা। যদি ঢালাওভাবে সরকরি ধান বীজ সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে কৃষকরা হয়তো এই ধরণের প্রতারণার হাত থেকে র(া পেতো।

এদিকে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে, ব্লকস্তরে বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিতভাবে তল্লাসী চলছে। সম্প্রতি ইসলামপুর ও ডালখোলা এলাকা থেকে ১৮৬ বস্তা নকল ধান বীজ উদ্ধার করা হয়েছে প্রকাশ যে, সরকারিভাবে কৃষকদের মধ্যে ধানবীজ সহ অন্যান্য বীজ সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকলেও অনেক চাষীরাই সেই সুযোগ নেন না বা পান না।

অন্যদিকে মহকুমা কৃষি আধিকারিক বলেন যে, নকল ধানবীজ যে কোথা থেকে আসছে তা জানতে তদন্ত চলছে। বীজ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলেই চাষীদের কৃষি দপ্তরে কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরমর্শ দিয়েছেন তিনি। এছাড়া নকল বীজ ব্যবহার করলে চাষীরা একদিকে যেমন আশানুরূপ ফলন পাচ্ছে না, অন্যদিকে ধানগাছের রোগ প্রতিরোধ (মতা কমে যাচ্ছে। এদিকে, জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহল অভিমত প্রকাশ করেছে যে, কৃষিদপ্তরের একাংশ এবং প্রশাসনের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে নকল বীজ বিক্রি(র সাহস পাচ্ছে। নইলে গাড়িগাড়ি নকল বীজ বাজারে আসছে কি করে?

কৃষি দপ্তরের একাংশ ও পুলিশ প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে সাটগাঁট না থাকলে এ ধরনের নকল বীজ বাজারে চাষীদের মধ্যে বিক্রি(করা কী সম্ভব? এ প্র(কিন্তু থেকেই যায়।

মালদায় বিষাক্ত চীনা রশুন আটক

তরুণ কুমার পণ্ডিত, মালদা ।। সম্প্রতি মালদার গাজোলে বিষাক্ত চীনা রশুন বোঝাই একটি লরি বি এস এফ আটক করে। কাস্টমস্ সূত্রে জানা গেছে রশুনগুলিতে এক ধরনের ক্ষতিকর ভাইরাস রয়েছে। এই রশুন খেলে মানুষের স্নায়ু ও মস্তিষ্কে বিভিন্ন রোগ ছড়াতে পারে। গত ২৯ মে গবেষণাগার থেকে জানতে পারা গেছে যে, রশুনগুলিতে 'এমকাসিয়া এলিট' ভাইরাস রয়েছে। এগুলি খেলে মানুষ পঙ্গু পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, এই বিষাক্ত চীনা রশুন চাষ করলে জমি বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে জমিতে এর চাষ হবে তার চারপাশে ৩০০ মিটার ব্যাসার্ধের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কৃষি গবেষণাগারের এই রিপোর্ট নিয়ে জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯ মেট্রিক টন রশুন বোঝাই লরিটি বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি বর্ডার দিয়ে ঢুকে কলকাতায় যাচ্ছিল। রশুনের বস্তাতে লেখা ছিল 'মেড ইন চায়না'। চীন থেকে বাংলাদেশ হয়ে এই রশুন ভর্তি বস্তাগুলি আই এস আই-এর মদতে এদেশে ঢুকতে পারে বলে পুলিশ প্রশাসনের ধারণা।

এখন সমস্যা হল, এই বিষাক্ত চীনা রশুনগুলি মালদার পুরাতন শ্মশানে পুড়িয়ে ফেলতে গেলে গ্রামবাসীরা বাধা দেয়। জেলাশাসক বলেছেন, এইগুলি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে 'চীনা গুলি' বা খেলনা যেগুলি ভারতীয় বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলিতেও বিষাক্ত পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল এবং সরকার থেকে তা শিশুদের মুখে দিতে নিষেধ করা হয়েছিল।

পরলোকে বিজেপি নেতা রমাপদ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শিলচরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক এবং বিজেপি-র কার্যকর্তা রমাপদ দাস গত ২৩ জুন পরলোক গমন করেছেন। তিনি বি জে পি-র শিলচর শহর সমিতির সভাপতি ছিলেন। শ্রীদাসের পরিবার দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হিসেবে শিলচরে এসেছিলেন। পরে কঠিন জীবনসংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় তাঁকে পুলিশ ধরলে শিলচর বারের তাবড় উকিলরা তাঁর স্বপক্ষে দাঁড়ান এবং তাঁকে জামিনে ছাড়তে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন বিচারপতি। এমনকী কয়েকজন মুসলমান উকিলও তাঁর পক্ষে দাঁড়ান। এতটাই জনপ্রিয়তা ছিল শ্রীদাসের।

গত ১২ জুন শিলচর বিমানবন্দর থেকে ফেরার সময় তিনি যে গাড়িতে ছিলেন সেটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। তাঁকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শ্যামাপ্রসাদের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুগামী রমাপদ দাস এককথায় অজাতশত্রু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল বলে মত প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক ও অ্যাডভোকেট বিমলাংশু রায়। বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সঙ্ঘের প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমলনাথ চৌধুরী, সদ্য নির্বাচিত সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, সুজিত ভট্টাচার্য, দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক তৈমুর রাজা চৌধুরী, রোটারিয়ান নির্মলেন্দু করপুরকায়স্থ প্রমুখ। শিলচর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মালদার কালিয়াচক বে-আইনী অস্ত্রের ভাণ্ডার

তরুণ কুমার পন্ডিত, মালদা ।। মালদা জেলার কালিয়াচক বাংলাদেশ সীমান্তে বে-আইনী অস্ত্রের ভান্ডার অনেকদিন থেকেই আছে। 'স্বস্তিকা'তে বহুবার এই বে-আইনী অস্ত্রের ব্যবহার, সংঘর্ষ এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের ঘটনা ছাপা হয়েছে। তবে গত ১৮ এবং ১৯ জুন দু-দিনে প্রচুর অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হওয়াতে পুলিশ প্রশাসন এখন নড়েচড়ে বসেছে। ১৮ জুন ইংরেজবাজার শহরের ত্রিমোহিনী মোড়ে জিম্বা শেখ নামে এক ব্যক্তিকে তিনটি নাইন এম এম পিস্তল, দুটি ওয়ান শাটার, ছটি ম্যাগাজিন এবং ৮০ রাউন্ড গুলি সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আশ্চর্যের বিষয় সে আগে পুলিশের চর হিসাবে কাজ করত। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নারায়ণপুরে পুলিশ এক কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে। এজাহার শেখ-এর বাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ তিনটি মাস্কেট উদ্ধার করে। নারায়ণপুরে ওই কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালানোর সময় গ্রামবাসীরা বাধা দেন। পরেরদিন শুক্রবার ১৯ জুন দুই দুস্কৃতী গয়েশ আলি ও ফিরোজ শেখকে পুলিশ আবার প্রচুর অস্ত্র ও গুলি সহ আটক করে। এরাও কালিয়াচকের নারায়ণপুরের বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে পুলিশ একটি বস্তার মধ্যে ৮টি কারতুজ, সাতটি ছ'ঘরা রিভালভার এবং একটি নাইন এম এম পিস্তল পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক ও সুজাপুরে মুসলিমদের হাতে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র আছে একথা গোয়েন্দা ও পুলিশ স্বীকার করলেও, উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা এতদিন হয়নি। গোটা অঞ্চল জুড়ে যে আরও অস্ত্র-শস্ত্রের ভান্ডার রয়েছে তার খোঁজ মিলছে না কেন? আসলে কংগ্রেস মুসলিম ভোটে জিতে ফুলে ফেঁপে উঠছে, এবং পুলিশ বেশি কিছু করতে গেলেই নেতাদের চাপে চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কথায় বলে গেঁয়ো যোগী নাকি ভিখ পায় না। তবে শতাব্দীর হাত ধরে প্রবাদ বাক্যেরও অর্থ পাল্টাচ্ছে। ফিকে হচ্ছে পুরনো ধারণা। পরিস্থিতির রূপ বদল হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এখন গেঁয়ো যোগীদেরই গুরুত্ব বাড়ছে দিনকে দিন। তাদের শিল্প-কীর্তির আকর্ষণই টেনে আনছে পর্যটকদের। গুজরাট থেকে ওড়িশা। প্রত্যন্ত গ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ, সহজ-সরল অনাড়ম্বর মানুষগুলির হাতের কাজই টেনে আনছে দূর-দূরান্তের পর্যটকদের। এই টানও প্রাকৃতিক। তবে সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নেই, কিন্তু আত্মীয়তার ভাব রয়েছে। গ্রামের মানুষের হাতে গড়া শিল্পের গুরুত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পারছেন তাঁরা। গ্রামীণ শিল্পীরাই বিদেশী পর্যটকদের গ্রামমুখী করে তুলছে।

ওড়িশার এক ছোট গ্রাম রঘুরাজপুর। পর্যটক টানার মতো এই গ্রামে তেমন কিছুই নেই। পর্যটনক্ষেত্রও না। গ্রামের আকার আয়তনেও যথেষ্ট ছোটো। ১০০-র থেকে কিছু বেশি পরিবারের বাস। তবে এত সবের পরেও গ্রামে কাতারে কাতারে পর্যটকরা আসছেন। গ্রামের শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি চাক্ষুষ করতেই বিদেশী পর্যটকেরা ভিড় জমাচ্ছেন। গ্রামের পটচিত্র দেখে তারা কিছু বুঝতে না পারলেও, শিল্পীর তুলির টান তাঁদের মনকে যেন ছুঁয়ে যায়। অনেকে সংগ্রহও করেছেন সেসব। এতদিন যাদের আঁকা পট গ্রামের মানুষ মুখ ফিরেও দেখেনি, তারাও এখন অবাক। সাদা চামড়ার মানুষদের ভিড় তাদেরও তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। নামি-দামী আন্তর্জাতিক ক্যামেরার লেন্সে এইসব গ্রামীণ চিত্র ক্যামেরা বন্দিও হচ্ছে। সেই সঙ্গে সেই গেঁয়ো যোগীও বিদেশীদের কাছে বাহবা পাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তর থেকে পাওয়া সূত্র অনুযায়ী, গ্রামীণ শিল্পের টানে ছুটে আসা পর্যটকের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। গত কয়েক মাসে এই সংখ্যা হাজারের ঘরে এসে পৌঁচেছে।

গুজরাটের এমনই এক গ্রাম কোডকা। এই গ্রামের বসতিও কম। গ্রামে পর্যটক টানার মতো কোনও পর্যটন ক্ষেত্র নেই। গ্রামের মানুষও ছ'মাস আগে স্বপ্নেও ভাবেননি তাদের গ্রামে দেশের বাইরের পর্যটকরা ঘুরতে আসবেন। কিন্তু এখন তা হচ্ছে। গ্রামের কাঁচের ওপর বিভিন্ন কাজ, আর বস্ত্র শিল্পের কারুকার্য দেখতেই পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্রাম ঘুরে লক্ষ্য করছেন শিল্পীদের প্রতিটি মুহূর্ত। অনেক পর্যটক গ্রামের মধ্যে রাত্রিবাসও করছেন। ছ'মাসের মধ্যে কোডকা গ্রামে ১,৬০০ পর্যটক ঘুরতে এসেছেন। যাদের মধ্যে অনেকে রাতও কাটিয়েছেন। এই চিত্র শুধু গুজরাট বা ওড়িশারই নয়। পর্যটন দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৮-এর অক্টোবর থেকে ২০০৯-এর মার্চ মাসের মধ্যে ৩৫ হাজার পর্যটক ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে ভ্রমণ করেছেন। এর মধ্যে ১০ হাজার পর্যটক গ্রামগুলিতে রাত্রিবাসও করেছেন। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে গ্রামে ভ্রমণের প্রবণতাও ধীরে ধীরে বাড়ছে। যার মূল আকর্ষণ শিল্পীদের হরেক শিল্প-কর্ম। পর্যটকদের গ্রামীণ নেশা-র কথা ভেবে সরকারিভাবেও বিভিন্ন ট্যুর প্যাকেজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। যে প্যাকেজের মধ্যে থাকছে শুধু গ্রামীণ এলাকায় ভ্রমণ। প্রতি মাসেই প্রায় পাঁচ'শ মতো পর্যটক গ্রাম ভ্রমণ করতে চায় বলেও খবর। এতে কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি গ্রামের মানুষেরও আর্থিক লাভ হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী বিক্রি করে তারা যথেষ্ট পয়সাও পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরকেও গ্রামে পর্যটকদের টানতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিতে হচ্ছে। গ্রামবাসীদেরকেই পর্যটকদের দেখভাল করতে হচ্ছে। ফলে তাদেরও মোটা টাকা রোজগারের সুযোগ রয়েছে। রাত্রিবাসের চার্জ ২০০ থেকে ২,০০০ টাকা। যে টাকাটার ভাগ পর্যটন দপ্তরও গ্রামবাসীদের মধ্যে হয়ে থাকে। ঝকঝকে শৌচাগার, উপযুক্ত খাদ্য-খাবার পরিবেশন, পর্যটকদের উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে গ্রামবাসীদের। সেই সঙ্গে কথা বলার জন্য ইংরেজিও।

পর্যটকদের আগমন একদিকে যেমন গেঁয়ো যোগীদের মর্যাদা বাড়াচ্ছে। তেমনি গুরুত্ব বাড়ছে গ্রামেরও। কেন্দ্র সরকারের নজর আসছে গ্রামগুলির দিকে। যা পর্যটকরা না এলে, গ্রামগুলি হয়তো অবহেলিত থেকে আরও অবহেলিতই থেকে যেত।

বিদেশী পর্যটকরা গ্রামের শিল্পীদের ছবি তুলছেন।

পাঞ্জাব পুলিশের সন্ত্রাস দমনে নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করল পাঞ্জাব পুলিশ। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় এক বিশেষ ধরনের গাড়িকে কাজে লাগাচ্ছে পুলিশ। পাঞ্জাব পুলিশের বিশেষ বাহিনী এই পদ্ধতি চালু করছে বলে জানা গেছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ ও জনবহুল এলাকায় খুব সহজেই জঙ্গিদের সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে বলে মনে করছে তারা। উন্নত প্রযুক্তির স্টীল ও পলি-কার্বোনেট সহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গাড়িগুলি তৈরি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গাড়ির মাধ্যমে অনায়াসেই দূর থেকে শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব। মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার ক্ষেত্রে এই ধরনের গাড়ি বিশেষ কাজে আসবে বলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

এই ধরনের গাড়ি তৈরির পশ্চাতে মূল কান্ডারি হলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন ডি জি পি, কে কে অত্রি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অত্রি ১৯৮০-৯০ সালের মাঝে যে খালিস্তানী আন্দোলন ঘটেছিল, সে সময় তিনি খালিস্তানীদের মোকাবিলায় বড় ধরনের সফলতা অর্জন করেন। আন্দোলনের মোকাবিলাতে তিনি এমনই এক ট্রাক্টর ব্যবহার করে সফল হন। তাঁরই উদ্ভূত পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের গাড়ি তৈরি করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলও এর অঙ্গ হিসাবে এক নতুন আইন প্রণয়নের কথা ভাবছেন। বিশেষত এই গাড়িতে মেশিনগান সহ দূর থেকে লড়ারও প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র রাখা থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

কেরলে সি পি এমের খৃস্টান তোষণের রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দলের সার্বিক মন্দার রেশ পিছু ছাড়ছে না সিপিএমের। লোকসভা ভোটে ভরাডুবির পর, তিন রাজ্যেই অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে দল। ত্রিপুরা কিছুটা পদে থাকলেও, অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে জেরবার বাংলা ও কেরল। এর মধ্যে কেরলের অবস্থা দিনকে দিন আরও বেহাল হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন ও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের লড়াই শুধু দলে ফাটলই ধরাইনি, সেই সঙ্গে দলের নেতৃত্বকেও ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই কান্ডের রেশ কাটা এখনই সম্ভব নয়। প্রকাশ কারাত থেকে পলিটব্যুরো পর্যন্ত মামলা গড়ালেও, সমাধানের কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। এরই মধ্যে রাজ্যপালকে নিয়ে পার্টি নেতৃত্ব দুই মেরুতে বিভক্ত। পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে ৩৩৭ কোটি টাকার দুর্নীতির মামলা সিবিআই কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। গতবছর ২৪ সেপ্টেম্বর কোচির কোর্টে মামলাটি ওঠে। রাজ্যের রাজ্যপাল আর এস গাভাই সিপিএম নেতা পিনারাই-এর বিরুদ্ধে ওঠা মামলাকে সমর্থন জানান। রাজ্যপালের নৈতিক সমর্থন এই দ্বন্দ্বে আগুনে ঘি জুগিয়েছে। রাজ্যপালের মতকে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে সমর্থন জানান। তিনি বলেন, তাঁর সমর্থন সাংবিধানিক। কিন্তু অচ্যুতানন্দনের মতকে মেনে নিতে পারছেন না দলের তাবড় তাবড় নেতারাও। রাজ্যপালের মতকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে আর এক চক্র। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একটা অংশ রাজ্যপালের মতকে কেন্দ্র করে কোর্টে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এখানেই অবশ্য থেমে থাকছে না এই দ্বন্দ্ব। ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে

সিপিআই, আর এস পি নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর ওপর বেজায় খাপ্পা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সদ্য সমাপ্ত কেরলের প্রাক্তন বাম-মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের জন্মর শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে দলের এক শ্রেণীর নেতারা অচ্যুতানন্দনকে নিমন্ত্রণও করেননি।

এই বিপর্যয়ের মাঝে পলিটব্যুরো অবশ্য খৃস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে যাতে কোনও বিদ্বেষ তৈরি না হয় সে বিষয়ে সজাগ। ১৯৫৯ সালে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে গঠিত কম্যুনিস্ট সরকার ভেঙ্গে যায়। যার পিছনে কাজ করে খৃস্টানদের স্বায়ত্তশাসনের লড়াই। আন্দোলনের চাপেই জওহরলাল নেহরু সরকার ভেঙ্গে দেয়। ১৯৫৯ সালে অঙ্গামাল্লায় অঙ্গামাল্লা সংগ্রামের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উৎসবে সাতজন খৃস্টান শহীদ হয়। নাম্বুদ্রিপাদের ১০০ বছর পূর্তির এই মুহূর্তে খৃস্টান বিদ্বেষ বা সংখ্যালঘুদের যাতে মন না চটে, সে বিষয়েও সিপিএম নেতৃত্ব বেশ সজাগ। ১০০ বছর পূর্তি উৎসবে দল এই বিষয়ের ওপরই বেশ জোর দেয়।

চার্চ নিয়ন্ত্রক আর্চ বিশপ মার পাওয়াধি সিপিএমকে কার্যত সতর্ক করেছেন। যাতে খৃস্টানদের স্বায়ত্তশাসনের দাবির মুখোমুখি দলকে দ্বিতীয়বার না পড়তে হয়। ইদানীং কালে সিপিএম খৃস্টান ইন্সটিটিউট অধিগ্রহণ করে শিক্ষার আমূল সংস্কার সাধন করায় বিশপ পরোক্ষে তার ফল সিপিএমের বিপক্ষে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। খৃস্টানদের দিক থেকে যাতে দল মুখ না ফিরিয়ে নেয়, সেই চাপ দেওয়াও শুরু হয়েছে। বিশপের পরামর্শ সেই ইঙ্গিতই বহন করে। ভোটের রাজনীতিতে হিন্দুদের থেকেও যে খৃস্টানদের ও মুসলিমদের গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বেশি, তা সিপিএমের তোষণ রাজনীতি থেকে বোঝা যাচ্ছে। রাজ্যে মোট ৪৫ শতাংশ খৃস্টান ও মুসলিম ভোটের যৌথ ভোটব্যাঙ্কে যাতে ভাঙন না দেখা দেয় সিপিএম এখন সেই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে।

সি পি এম বাদে বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট

(৫ পাতার পর)

মোল্লা বলেছেন — "মন্ত্রিসভা এবং পার্টি নেতৃত্বের পরিবর্তন করে ঘুরে দাঁড়াবার একটা এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত। কারণ ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এমনিতে হার তো হবেই।"

সিপিএম বাদে বামফ্রন্টের সমস্ত দলই আজ বুদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে। তাঁদের কথা বুদ্ধবাবু নিজের পার্টিসহ বামফ্রন্টের কোনও পার্টিকে গ্রাহ্য করেন না। তিনি উদ্ধত এবং একরোখা। তিনি প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল। বামফ্রন্টের সভায় যখন বুদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়, তখন কিন্তু বিমান বসু নিশ্চুপ থাকেন।

এই থেকে বোঝা যায় বিমানবাবুও মনে প্রাণে চান বুদ্ধবাবু সরে যান। পার্টিতে এখন গ্যাং অফ ফোর বা দুষ্ট চতুষ্টয় (চীনের পার্টির মতো)-এর কথা উঠেছে। এঁরা নাকি হলেন বুদ্ধ-বিনয়-শ্যামল সুভাষ?

সিপিএম পার্টিতে বিশেষ প্লেনামের দাবি উঠেছে। কেন্দ্রেও প্রকাশ কারাতকে সরিয়ে পিল্লাইকে সাধারণ সম্পাদক করার কথা উঠেছে। কারণ প্রকাশ-এর নেতৃত্বেই কেরল পার্টি উঠে যাবার অবস্থায় পৌঁছেছে।

ভবিষ্যতে এমনও হতে পারে, সি পি এমকে বাদ দিয়ে বামফ্রন্টের অন্যান্য দল একত্রে বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সিপিএম শয্যাশায়ী, তার কোরামিন চাই। কে দেবে সেই ঔষধ? এ তো— শিরে হইল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা?

অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায়

উন্নয়ণের টাকা যাচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক

বাসুদেব পাল ।। দক্ষিণ অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় বহু বছর ধরেই সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ কয়েকটি জঙ্গি দলের কোষাগারে জমা পড়েছে। সেজন্য নানা কৌশলও অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় দীর্ঘদিন থেকে এন সি হিলস্ অটোনমাস কাউন্সিল অর্থাৎ স্বশাসিত পরিষদ রয়েছে। পরিষদের ক্ষমতা দীর্ঘদিন ভোগ করেছে কংগ্রেস। গত স্বশাসিত পরিষদ নির্বাচনে কোনওভাবে বিজেপি এবং ডিমাসা জনজাতিদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত অটোনমাস স্টেট ডিমাণ্ড কমিটি (ASDC)-র জোট পরিষদের ক্ষমতা দখল করে। ২০০৭-এ নির্বাচনের মুখে জেলার বিধায়ক ও ডিমাসা জনজাতি নেতা (কংগ্রেস) ও প্রাক্তন মন্ত্রী গোবিন্দ লাংথাসার পরিবারের নিন্দু লাংথাসা নিহত হন। স্বশাসিত পরিষদের প্রার্থী নিন্দু ২০০৭-এর ৪ জুন নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে উমরাংশুর কাছে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে প্রাণ হারান। তখনকার মতো নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্যপাল তার সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে (লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) অজয় সিং) সেখানে তার প্রতিনিধিকে ক্ষমতায় বসান। পরে নির্বাচন হয়। ২০০৮-এ বিজেপির সঙ্গে জোট গঠন করে স্বশাসিত পরিষদের প্রধান কার্যনির্বাহী হন এ এস ডি সি-র নেতা দিপোলাল হোজাই। পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, জঙ্গিগোষ্ঠী ডি এইচ ডি (জুয়েল গার্লোসা)-কে পরিষদ অর্থ যোগান দিচ্ছে। দিপোলাল হোজাই পদচ্যুত এবং গ্রেপ্তার হন। কিন্তু এক অদৃশ্য হাতের কায়দায় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মুক্তি পান ও কংগেসে যোগ দেন। পরে মুখ্য কার্যনির্বাহী (CEM) হন মোহিত হোজাই। মোহিত হোজাই জঙ্গিদের প্রচুর নগদ টাকা দেওয়ার সময় হাতে নাতে ধরা পড়েন।

ঃ নেতা, সন্ত্রাসবাদী ও সরকারি আঁতাতঃ

অসম থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'দি সেন্টিনেল' পত্রিকা সম্প্রতি এক অন্তর্তদন্তমূলক সংবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটির ১৫ জুন প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে উগ্রপন্থীদের হাতে সরকারি কোষাগার থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা চালান হওয়ার জন্য এক সংগঠিত দুর্নীতিচক্র কাজ করেছে। তাতে সরকারি অফিসার, রাজনৈতিক নেতা ও জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদী চক্রের জোট একসঙ্গে কাজ করেছে। সন্ত্রাসবাদ এবং হিংসা এই অশুভ আঁতাতেরই দুষ্পরিণাম। এবং আঁতাতের একটা সূত্র অবশ্যই রাজধানী দিসপুরের রাজনৈতিক দাদারা। এই বিষয়ে তদন্তের জন্য একসময় বিচারপতি মণিসেনা কমিশন গঠন করা হয়। বর্তমানে এই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় তদন্ত সংস্থা বা এন আই এ-কে হস্তান্তর করা হয়েছে। এখন লাখ লাখ ডলারের প্রশ্ন হল, আদৌ এই তদন্তের ফলাফল সার্বজনীনভাবে প্রকাশিত হবে কি না! কেননা, এই তদন্তে হাফলং (উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার সদর) এবং দিসপুরের অনেক তাবড় কংগ্রেসী নেতার নাম জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

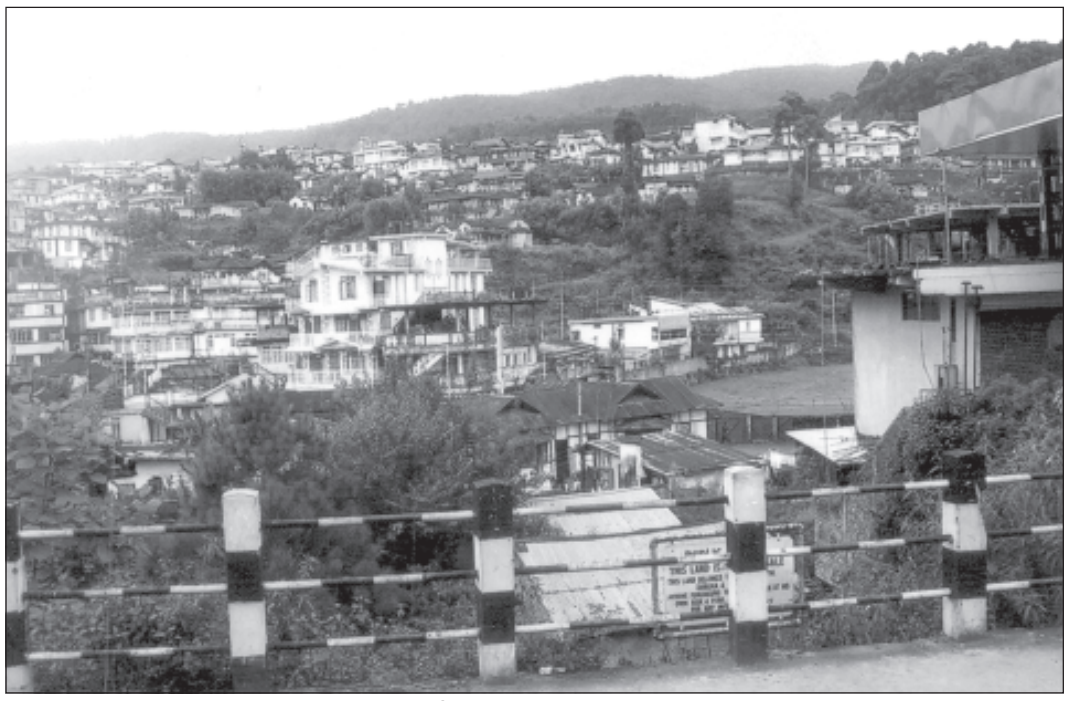

ছবির মতো হাফলং শহর।

উগ্রপন্থীদের তহবিলে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ চালান দেওয়ার ব্যাপারে এক ব্যবসায়ী তথা ঠিকাদারের নাম বারে বারে উঠে এসেছে — আর এস গান্ধী। ১৯ অক্টোবর ২০০৬ সালে ওই বিতর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে এন সি এইচ এ সি (North Cachar Hills Autonomous Council)-র এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি করার আগে অটোনমাস কাউন্সিলের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। ওই চুক্তির জন্য গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় — কাউন্সিল গুয়াহাটি স্টেটব্যাঙ্কের (SBI) সোনাকুটি শাখায় এবং আই ডি বি আই ব্যাঙ্কের গুয়াহাটি শাখায় NCAC (A/C Dimasa) নামে একটি করে একাউন্ট খুলবে। সেই একাউন্টে নওগাঁ পেপার মিলকে বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরাসরি জমা হবে। অনুরূপভাবে হাইলাকান্দি জেলার কাছাড় পেপার মিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা করার জন্য পাঁচগ্রামের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং বদরপুরের এস বি আই (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া)-এ একই নামে একাউন্ট খোলা হয়। ওই টাকা তোলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতাও দেওয়া হয়। ১৯ অক্টোবর, ২০০৬-এর প্রস্তাবের বয়ানটা এরকম ছিল — "Resolved further that in view of the forgoing agreement, the council shall forthwith open separate Bank accounts under the name of N.C.A.C. (A/C Dimasa) ..... the bank shall, forthwith and is that any further act of the council, transfer the entire recipt amount to the account of the contractor, who shall intimate the council of recipt of the money at the earlier...."। এই প্রস্তাবই বলে দিচ্ছে অটোনমাস কাউন্সিলকে প্রদত্ত অর্থ নয়ছয় করার কীরকম পাকা ব্যবস্থা। এই চুক্তি ও প্রস্তাবের সময়ে অটোনমাস হিল কাউন্সিলের মুখ্য কার্যনির্বাহী ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী গোবিন্দ লাংথাসার পুত্র পূর্ণেন্দু লাংথাসা। পূর্ণেন্দুও ব্ল্যাক উইডো জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন।

ঃ সন্ত্রাসবাদীদের স্বীকারোক্তি ঃ

যে কজন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের ক্যাডার ধরা পড়েছে তাদের জবানবন্দীতেও জঙ্গিদের তহবিলে ব্যাপক অর্থ যোগানের খবর বের হয়েছে। এরকম একজন ধৃত ব্ল্যাক উইডো জঙ্গি হল মিপুত রাজিজুং। সে ২০০৭-এর ৪ জুন পূর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসা হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ। সে জানিয়েছে এন সি হিলস্ অটোনমাস কাউন্সিলের মুখ্য কার্যনির্বাহী (CEM)-কে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যা করা হয়েছে ডি এইচ ডি (ব্ল্যাক উইডো) গোষ্ঠীর সহ-অধিনায়ক ডেনিয়েল ডিমাসার কথামতো নির্বাচনী এলাকা বিন্যাস না করার কারণে। তবে সি ই এম এবং নিন্দু লাংথাসা ডেনিয়েলকে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। মিপুত স্বীকারোক্তিতে আরও জানিয়েছে — ডেনিয়েলের নেতৃত্বে ব্ল্যাক উইডোর একটি গোষ্ঠী ২০০৭-এর ২০ অক্টোবর বাঁশ ব্যবসায়ী আর এস গান্ধীর ছয়টি ট্রাক জ্বালিয়ে দেয়। পরে দিপোলাল হোজাই (এ এস ডি সি নেতা ও প্রাক্তন কাউন্সিল প্রধান) গান্ধীর কাছ থেকে দু'কোটি টাকা নিয়ে গিয়ে ডেনিয়েলকে দেয়। মিপুত বলেছে কাউন্সিল সদস্য প্রফুল্ল ফোগলো নিজে ৫০ লক্ষ টাকা গেরা গ্রামে ডেনিয়েলকে পৌঁছে দিয়েছিল।

অপর ধৃত ডি এইচ ডি (গার্লোসা) জঙ্গি সুব্রত থাউসেন ওরফে পাইপ্রাং ডিমাসা পুলিশকে জানিয়েছে, বাঁশ ব্যবসায়ী আর এস গান্ধী তাদের গোষ্ঠীকে সাড়ে চার কোটি টাকা দেয় ২০০৬-এর শেষ দিকে। তখন টাকা আদায়ের জন্য তাদের স্কোয়াড আর এস গান্ধীকে ১৫ দিন গভীর জঙ্গলে আটকে রেখেছিল। আর এস গান্ধীর ছেলে সাড়ে চার-কোটি টাকা দিয়ে বাবাকে মুক্ত করে।

এখন দেখা দরকার কোন কোন ব্যক্তি এভাবে জঙ্গিদের অর্থ সরবরাহ করার জন্য দায়ী। তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার আর এইচ খাঁন, দিপোলাল হোজাই, রাজ্যের অর্থদপ্তর-এর ভূমিকা কি ছিল? এমনকী রাজ্যের একজন সাংবিধানিক প্রধানও সন্দেহের উর্দ্ধে নন।

২০০৭-এর ৪জুন একই দিনে লাংথাসা পরিবারের পূর্ণেন্দু ও নিন্দু জঙ্গিদের হাতে নিহত হন। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন (১২ জুন হওয়ার কথা ছিল) স্থগিত হয়। রাজ্যপাল অজয় সিং দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। ২০০৮-এর জানুয়ারিতে দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ASDC-BJP জোট স্বশাসিত পরিষদের ক্ষমতা দখল করে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা অধিগ্রহণে সবচেয়ে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন রেদাউল হুসেন খাঁন এবং জেলার ডেপুটি কমিশনার অনিল বরুয়া। শ্রীবরুয়া দৃষ্টিকটু ভাবে লাগাতার পাঁচবছর ডি সি পদে কর্মরত ছিলেন। সাধারণত তিন বছরই একজন সরকারি অফিসার এক এলাকায় থাকেন। নির্বাচনের সময়েও ডি সি ছিলেন অনিল বরুয়া।

ঃ মণিসেনা কমিশন ঃ

রাজ্যপালের শাসন চলাকালীন ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। জেলার মুখ্য বনপাল (DFO) ডি আর জামান ওই সময়ে বেতন বহির্ভূত খাতে অনেক টাকা তুলেছেন। উদাহরণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট দুটি চেক নম্বরের উল্লেখ করা হল।

তাং — ৭।৮।২০০৭, চেক নং — ০০৬২৭০১, টাকার পরিমাণ - ৫০,০০০০০/

তাং — ১৪। ১২।২০০৭ চেক নং - ০০৬২৯৯৪, টাকার পরিমাণ - ৬৫,০০০/

তদন্ত করতে গিয়ে মণিসেনা কমিশন খুঁজেই পায়নি ওই টাকা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়েছে। তবে ওই সময়ে রাজ্যপাল মহোদয় নিয়মিতভাবে জেলা সদর হাফলং-এ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর একজন এ ডি সি-র ভূমিকাও সন্দেহজনক বলে জানা গেছে।

ক্ষমতায় বসেই মুখ্য কার্যনির্বাহী দিপোলাল হোজাই ডি এফ ও-কে গুয়াহাটির ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে একটি আলাদা একাউন্ট খুলতে চিঠি দেন। যদিও ইউ বি আই-এর এ টি রোড শাখায় আগে থেকেই একটি একাউন্ট ছিলই।

সূত্র মতে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে অথরিটির (NHA) কাছ থেকে রাস্তার জন্য জমি (ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর) অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ নর্থ কাছাড় হিলস্ অটোনমাস কাউন্সিল ১৫ কোটি টাকা পেয়েছিল। ওই টাকা জমির মালিকদেরকে দেওয়ার কথা। মণিসেনা কমিশন বারবার অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছে, যারা ওই টাকা পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন তাদেরকে টাকা আদৌ দেওয়া হয়নি, বঞ্চিত করা হয়েছে। দিপোলাল হোজাই এক চিঠিতে ডি এফ ও-কে পি আই ইউ-র লামডিং থেকে ৪৮,৭৪,৪১৭ টাকা, ANHAI থেকে ৭৮ লক্ষ টাকা (কাঠ বাবদ), শিলচর পি আই ইউ থেকে, (NHAI54-9E) মাইবং থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত চার লেনের সড়ক তৈরিতে সাড়ে পাঁচ কোটি

উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা

উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার আয়তন ৪,৮৮৮ বর্গ কিলোমিটার। ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে লোকসংখ্যা ১ ল(৮৬ হাজার ১৮৯ জন। জেলা সদর হাফলং। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জেলায় মোট ৫৩৬টি ঘর-বাড়ি জ্বালানো হয়েছে। তার মধ্যে ২১৬টি জেমি নাগাদের এবং বাকী সবই ডিমাসাদের। ৪৮৯২ জন ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তার মধ্যে নাগা জনজাতিদের সংখ্যা ১৫০০ জন। সব মিলিয়ে ত্রাণ শিবিরের সংখ্যা ২৯টি।

জলায় অব্যাহত জাতিদাঙ্গা ও সন্ত্রাসবাদ

নতিক নেতা, অফিসার ও সন্ত্রাসবাদীদের হাতে

এবং লামডিং থেকে মাইবং পর্যন্ত বনাঞ্চ ল তৈরি করতে আরও সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা দিতে বলেন। আবার তহবিল সাইফন করার জন্য গুয়াহাটির - ইউ বি আই-তে আরও একটি আলাদা আমানত খোলা হয়। এদিকে হোজাই-এর কথায় ডি এইচ ডি (গার্লোসা) নেতা জুয়েল গার্লোসা নিয়মিতভাবে গুয়াহাটির একটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা-পয়সা পেতেন। আবার সি ই এম-এর কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর ডি এফ ও সাহেব পর পর টাকা তোলেন।

তাং - ১৩।৬।০৮ চেক নং-৭০৯৬৯ টাকার পরিমাণ - ৭ লাখ।

তাং -১৭।৬।০৮, চেক নং - ৭১০০২, টাকার পরিমাণ - ৩ লাখ।

এসবই বেতন বহির্ভূত খাতে। এদিকে জামান সাহেব সব মিলিয়ে বেতন বহির্ভূত খাতে ৯০১.৬৫ লক্ষ টাকা ২০০৭-এর ১৩ জুন থেকে ২০০৮-এর ১৭ জুন এর মধ্যে তুলেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র মতে, বিচারপতি মণিসেনা কমিশন জানতে পেরেছে যে, দিপোলাল হোজাই তার ঘনিষ্ঠ পবিত্র নুনিসাকে কোটি কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দিয়েছে। যখন ব্ল্যাক উইডো গোষ্ঠী (জুয়েল গার্লোসা) নুনিসার কাছ থেকে তাদের ভাগ দাবী করে তখন তারা তা দিতে অস্বীকার করে। ঘটনাচক্রে তারপরই ব্ল্যাক উইডো জঙ্গি গোষ্ঠী দিপোলালকে পদত্যাগ করতে চাপ দেয়। পরবর্তীতে মোহিত হোজাইকে ২ জানুয়ারি, ২০০৯-এ ক্ষমতায় বসানো হয়। এদিকে রেদাউল হুসেন খাঁন দিসপুরে (রাজধানী) তার প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে আনতেন। ফলে আশ্চর্যজনকভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আজ্ঞাতেই কাউন্সিলের নিজস্ব একাউন্টে বিপুল অর্থ জমা হয়ে যেত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় স্বশাসিত পর্ষদের পি ডব্লিউ ডি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (প্রাক্তন) হামজানম লাংথাসা মণিসেনা কমিশনে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, তাঁর দপ্তরকে খাতায় কলমে ১১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি হাতে পেয়েছিলেন মাত্র ৩.৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা কম দেওয়া হয়েছিল। হামজানম লাংথাসা বিজেপি-র টিকিটে জিতে পরে কংগ্রেসে যোগ দেন। সূত্র মতে আরও জানা গিয়েছে যে, ২৪ এপ্রিল ২০০৭-এ স্বশাসিত পরিষদের ক্ষমতায় যখন কংগ্রেস অধিষ্ঠিত ছিল তখন প্রধান কার্যনির্বাহী ছট্রড্রত্তগ্ন ছিলেন পূর্ণেন্দু লাংথাসা। দ্বাদশ অর্থ কমিশনের মঞ্জুরীতে স্কুল-বাড়ি সারাই এর জন্য ৮৪.৬৫ লক্ষ টাকা রিলিজ করা হয়েছিল। বাস্তবে শিক্ষাদপ্তর আজ পর্যন্ত কোনও টাকাই পায়নি।

বিপুল সরকারি অর্থ জঙ্গিদের তহবিলে চালান করে দেওয়ার সরকারি পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী রেদাউল হুসেন খাঁন মূলত অসমের ধুবড়ি জেলার মানকাচার-এর বাসিন্দা। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় সদর শহর হাফলং-এ তিনি সি ডি পি ও হিসেবে ১৯৯৬ এ চাকরিতে যোগ দেন (বর্তমানে ধৃত অবস্থায় জেলে)। অসমের চৌকস মন্ত্রী রাহুল রায় (হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়ার বিধায়ক) রাজ্যের সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী হওয়ার পর উচ্চাকাঙ্ক্ষী রেদাউল হুসেন তাঁর মাধ্যমে দিসপুরের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক এবং যোগাযোগ গড়ে তোলেন। হুসেনের নেটওয়ার্ক খুবই সক্রিয় ছিল, যখন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার স্বশাসিত পরিষদের প্রধান কার্যনির্বাহী ছিলেন কংগ্রেসের মন্ত্রীপুত্র পূর্ণেন্দু লাংথাসা। বিগত এ এস ডি সি-বিজেপি জোটের আমলে দেখা যায়

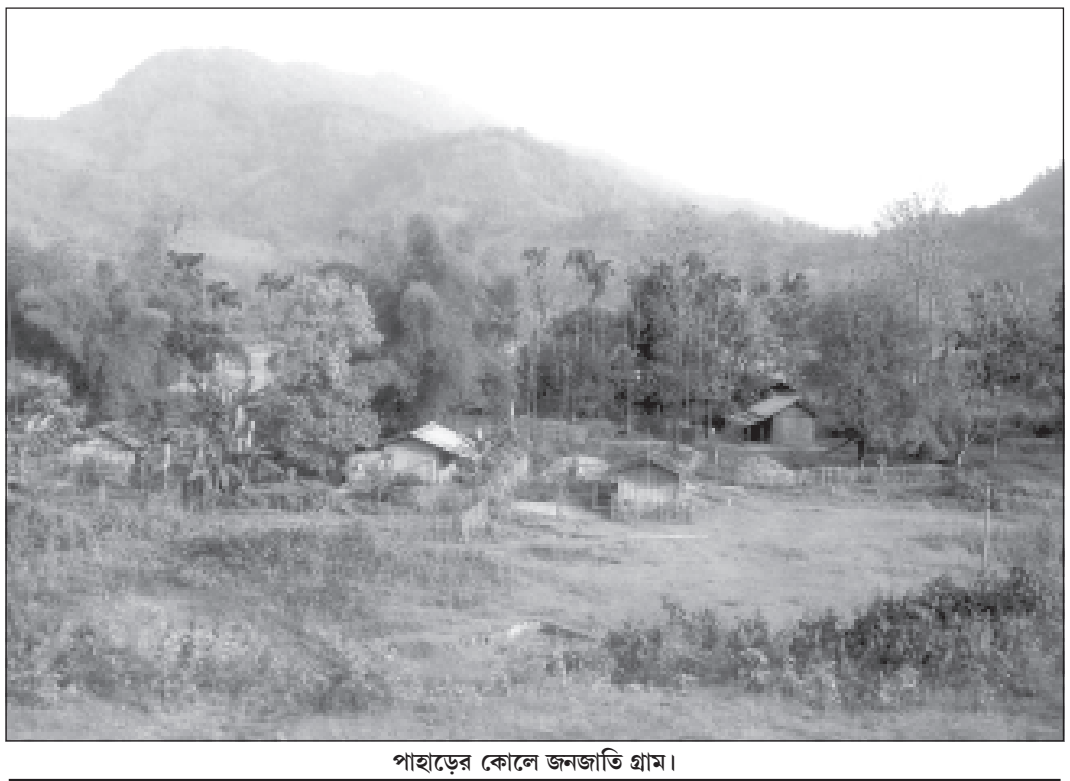

পাহাড়ের কোলে জনজাতি গ্রাম।

পূর্ববর্তী সময়ে সরকারি তহবিল ব্যাপকভাবে তছরূপ হয়েছে। সি ই এম পূর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসার জোড়া হত্যাকান্ডের ফলে গভর্ণর ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেন ২০০৭ সালে। তখন দেখা গেছে, ওই সাত মাসে রেদাউল হুসেন খাঁন ওভারটাইম কাজ করেছেন।

ঃ রেদাউল হুসেন খান-এর কীর্তি ঃ

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে খাঁন সাহেব একইদিনে তিনটি আমানত থেকে চেকের মাধ্যমে ৩৩ কোটি টাকা তুলেছেন। চেক নং ও তোলা টাকার হিসাব —

স্বশাসিত পরিষদের প্রথম দফার নির্বাচন হয় ২০০৭-এর ২৬ নভেম্বর। সুযোগমতো সেই সময়েও খাঁন টাকা তুলেছেন - চেক নং-০০৬৩৭৯ এ ১.৮৬ কোটি টাকা। ২৮ নভেম্বর আবারও ৯৬ লক্ষ টাকা তুলেছেন চেক নং- ০০৬৩৭৯৩ ব্যবহার করে। এটা ঠিক ১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে। উপরোক্ত প্রতিটি টাকাই তোলা হয়েছে বেতন বহির্ভূত খাতে।

তারিখ	চেক নং	ওঠানো টাকার পরিমাণ
৬।৭।০৭	০০৬২৮০৪	৩.০৫ কোটি
	২২৬২৮০৫	৫.২৫ কোটি
	০০৬২৮০৬	২৮.৫০ কোটি
১১।৭।০৭	০০৬৬২৯৩১	৬৮.০০ লক্ষ
৩।৯।০৭	০০৬৩৭১৮	৯.২৪ লক্ষ
	০০৬৩৪৮৭	৪.৫০ লক্ষ
	০০৬৩৭৪৫	২৮.৫০ লক্ষ
	০০৬৩৭৪৬	৩.৫ কোটি
২০।১১।০৭	০০৬৩৭৪৭	৫.২৫ কোটি

এবং অবশ্যই রাজ্যপালের হাতে ক্ষমতা থাকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ তোলা হয়েছে। এইসব ছাড়াও খান আরও টাকা উঠিয়েছেন — ৭০৮৩২ নম্বর চেকে ২.৫০ লক্ষ টাকা, চেক নং - ৭১৪৯৩-তে এক কোটি টাকা এবং চেক নং-৭১৪৯৪-এ ৮৫.৭২ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। খাঁনের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। খাঁনের পরামর্শে তদানীন্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী (সি ই এস) পূর্ণেন্দু লাংথাসা জেলা কৃষি ও বনসৃজন মিশন আরম্ভ করেছিলেন। তবে ওই প্রকল্প কাজ শুরু করার আগেই পূর্ণেন্দু খুন হয়ে যান। জেলায় কৃষি আধিকারিক আব্দুল আলিমকে প্রকল্পের ডিরেক্টর করা হয়। এরকম কোনও ব্যবস্থা সারা দেশে কোথাও নেই। ওই মিশনের নামে কাজুবাদামের চারা বিতরণের খরচ বাবদ খাঁন সাহেব কোটি কোটি টাকা ঝেড়ে সাফ করে দিয়েছেন। মেসার্স বি ডি এন্টারপ্রাইজ, শিলং রোড, লঙ্কা, অসম। বারবার চারা যোগান দিয়েছে। তার চালান রিসিটপাওয়া গেছে। হাফলং -এর উপরোক্ত মিশনকে বি ডি এন্টারপ্রাইজ ৫০,০০০ চারা ট্রাকে করে যোগান দিয়েছে। এবং সেজন্য ৬৫ টাকা প্রতিটি চারা গাছের দাম হিসেবে ৩.২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি মণিসেনা কমিশনের কাছে আলিম স্বীকারোক্তিতে বলেছেন — "আমাকে খাঁনের হাতের পুতুলের মতো ব্যবহার করা হয়েছে।" বস্তুতপক্ষে খাঁন দিসপুরের রাজনৈতিক বসেদের হাত করে দুর্নীতির এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। রাজ্যপালের দায়িত্বে থাকার সময়ে খাঁনকে তার গেমপ্ল্যান-এ কোনও ইতরবিশেষ করতে হয়নি। জেলার পূর্বতন ডি সি অনিল বরুয়াও সন্দেহভাজনদের তালিকায় রয়েছেন। খাঁন ও বরুয়া যেন ..... মাসতুতো ভাই। এখানে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিদের সততার লেশমাত্র পাওয়া যায়নি। অথচ খানের নাম কিন্তু দুর্নীতির তদন্তকারী মণিসেনা কমিশনের 'সন্দেহভাজনদের' নামের তালিকায় কোনও অদৃশ্য কারণে দেখা যায়নি, এমনকী কমিশনের রিপোর্টের সংযোজিত অংশেও নেই। কেন? তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলাতে সন্ত্রাসবাদ একটা রীতিমতো বড় শিল্প-কারখানা। এখানে বিনিয়োগ হয়, চক্রবৃদ্ধি তে কয়েকগুণ মুনাফা আসে। সেই মুনাফা যায় জঙ্গি এবং রাজনৈতিক দাদাদের পকেটে। এই দাদারা হাফলং এবং দিসপুর — দুটো জায়গাতেই আছেন বহাল তবিয়তে। এখন জাতীয় তদন্ত সংস্থা (National Investigation Agency) তাদের তদন্তে কি প্রকাশ করে সেটা জানার অপেক্ষায় আমরা অনেকেই রয়েছি।

ঃ চলমান সন্ত্রাসবাদ ঃ

প্রসঙ্গত, দু'একটা কথা উল্লেখ করা জরুরি, উত্তর কাছাড় জেলাতে মূলত ডিমাসা জনজাতিদের বাস হলেও বেশ ভালো সংখ্যায় নাগা জনজাতিরাও বসবাস করেন। এছাড়াও রয়েছেন বঙ্গভাষী, নেপালিভাষী ও হিন্দিভাষীরাও। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলাতে নাগাল্যান্ডের কুখ্যাত শক্তিশালী জঙ্গিগোষ্ঠী এন এস সি এন জঙ্গিদের হাত ধরেই ডি এইচ ডি (ডিমা হালাম দাওগা)-র সৃষ্টি। এন এস সি এন জঙ্গিদের একশ শতাংশই খৃস্টান। এখানে আর একটা ব্যাপার হল — উত্তর কাছাড় জেলাতে মার (Hmar) সম্প্রদায়ও হাফলং-এর শহরতলী এলাকায়ও বসবাস করে, যাদের প্রায় একশভাগই খৃস্টান। ২০০৩-এ একবার ডি এইচ ডি-র সঙ্গে তোলার বখরা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের দেওয়া-নেওয়া নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। মার (Hmar) দের এক জঙ্গিগোষ্ঠী অসম-

(এরপর ১০ পাতায়)

নিপীড়িত ডিমাসা জনজাতিদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

উদয় কুমার দাস ।। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার অসহায় নিপীড়িত দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চ ল সেবা ভারতী। সেবা ভারতীর সহযোগিতায় শিলচর কেশব স্মারক সমিতির মাধ্যমে দুর্গত পরিবারদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। গত ২৩ জুন কাছাড় জেলার দুটি স্থানে ত্রাণ সমাগ্রী দেওয়া হয়। প্রথমটি লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত শিবস্থান কমিউনিটি হলে এবং দ্বিতীয়টি লক্ষ্মীপুর থানারই শিবস্থান মুলিওরাতে। উদ্বাস্তুরা সকলেই আপার লোদী এবং লোয়ার লোদীর বাসিন্দা। এবং ডিমাসা জনজাতির। দুই স্থানে মোট ৭০ পরিবারের প্রত্যেক পরিবার পিছু একটি কম্বল, একটি থালা, একটি গ্লাস দেওয়া হয়। এছাড়া শিশুদের বিভিন্ন ধরনের পোষাক বিতরণ করা হয়। ৭০ পরিবারে ১৬২ পুরুষ, ১৭১ মহিলা এবং ১৯ জন শিশু রয়েছেন।

সমিতির অন্যতম সদস্য বলরাম দাস রায় দুর্গতদের হাতে কম্বল, থালা, গ্লাস ইত্যাদি তুলে দেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন হরিসাধন কোনার, ডাঃ সুকান্ত কর, প্রীতম বর্মন, সঞ্জীব পাল এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্ত প্রচারিকা সুপর্ণা দে।

অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের নির্যাতন

গত ১৫ জুন সংখ্যায় 'স্বস্তিকার' সম্পাদকীয় অস্ট্রেলিয়ায় কেন এই বর্বরতা প্রসঙ্গে এই নিবেদন। সত্যিই বিগত কিছুদিন যাবৎ সেই দেশে নারকীয় ভারতীয় নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। যার নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই। বহমান ঘটনায় উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করছেন অভিবাসী ভারতীয়দের দেশে অবস্থানরত অভিভাবক এবং অভিভাবিকারা। উদ্বেগ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, অনেক ভারতীয় সে দেশের চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত এবং ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার বাকি অংশটুকু শেষ করবেন কিনা তা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, অস্ট্রেলিয়ায় পাঠরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। যদিও সেই দেশের সরকার এই ঘটনাবলীকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কিন্তু এটা যে জাতি-বিদ্বেষের এক বিষময় ফল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে অস্ট্রেলিয়দের অস্তিত্ব হারানোর ভয়ই এর মূলে কাজ করছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ক্যাঙারুদের দেশে এই ঘটনাবলী প্রথম নয়। ২০০৪ সালে একটি স্লোগানকে কেন্দ্র করে এই ধরনের বিদ্বেষমূলক প্রচার করা হয়। সেটি ছিল ''অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়দের জন্য''।

পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা যায় যে, গত এক বছরে ভারতীয় ছাত্রদের উপর প্রায় ৭০ বার আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তাই বলা যেতে পারে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়দের সুনামই ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। খসে পড়েছে সভ্যতার মুখোস।

সুশান্ত কুমার দে, গ্রীণপার্ক, কলকাতা-১০৩

'কর্মখালি'- র বিজ্ঞাপন

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শাসকশ্রেণীর মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যকলাপ ও নিজ পদে যাবতীয় অপদার্থতার জন্য আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উপযুক্ত কাউকে না পাওয়ার কারণে উক্ত পদের জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী যারা ওনার থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও বেশি অপদার্থ , তাদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। নিম্নলিখিত স্থানগুলি যথাযথ, উপযুক্ত, প্রমাণসহ পূরণ করিয়া আগামী ১৪।৪।২০১০ সালের মধ্যে অবশ্যই পৌঁছাতে হইবে। দরখাস্তের সহিত তিনকপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো অবশ্যই দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলি পূরণীয় ঃ — (১) নাম, (২) পিতার নাম, (৩) ঠিকানা, (বর্তমান, স্থায়ী), (৪) বয়স, (৫) আজ অবধি কতগুলি মানুষ খুন করা ও করানোর অভিজ্ঞতা, (৬) বলপূর্বক কত হেক্টর জমি কেড়ে নেওয়ার তালিকা, (৭) নিজ অনুকূলে হার্মাদের সংখ্যা (৮) বে-আইনী কত হাজার অস্ত্রসস্ত্র, গুলি ও পুলিশের ইউনিফর্ম গচ্ছিত আছে তার তালিকা, (৯) দরখাস্তের পূর্বে কতগুলি নির্বাচনে রিগিং করে, চুরি করে, ছাপ্পা দিয়ে, জাল ভোট দিয়ে জেতার অভিজ্ঞতা (১০) কত হাজার বিরোধীপক্ষের লোককে গৃহহারা করেছেন ও গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছেন (১১) শিল্পকে ধ্বংস করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (১২) নিজ অনুকূলে ধর্ষকের সংখ্যা কত (১৩) তাপসী মালিকের ন্যায় কতগুলি কিশোরীকে হার্মাদ দিয়া ধর্ষণ ও হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত, (১৪) কোন পদে থাকাকালীন কতবার পদত্যাগ করিবার মিথ্যা আস্ফালন করিয়াছেন?

অভিজ্ঞতার বিচারে যার, যথাযথ পূরণ করা দরখাস্ত বোর্ড কর্তৃক বোর্ডের দরখাস্ত পরীক্ষকগণ — যথাক্রমে লক্ষ্মণ শেঠ, সুশান্ত ঘোষ, তড়িৎ তোপদার, (মজিদ মাস্টার), পরীক্ষিত হবার পর বিবেচিত ব্যক্তিকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রজেক্ট করে প্রচার করা হইবে। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বলা যাইতেছে যে, বোর্ডের ব্যক্তিগণও দরখাস্ত দিতে পারিবেন। ১৪।৪।২০১০-এরপর কোনও কারণেই কোনও দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না। অবশ্য এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হইলে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

তিনবিঘা

আবারও ২৬ জুন। আজ থেকে সতের বছর পূর্বে '৯২ সালে তিনবিঘা করিডর বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তার পূর্বে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত নরসিমা রাওয়ের দূতরূপে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনবিঘা করিডর দিলে একমাসের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হবে। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে আমরা প্রতীক্ষা করলাম। ওইদিন '৯২ সালের ২৬ জুন দিন-দুপুরে দহগ্রামের ৮২টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সবাইকে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষায় জ্যোতি বসু বা নরসিমারাও এগিয়ে এলেন না। আজও ছিটমহলবাসী ভারতীয়রা অনাগরিক।

(১) এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মূল্য কি?

(২) কেনই বা এই করিডর রক্ষায় প্রতিদিন কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়?

(৩) ভবিষ্যতেও এই পথে অবাধে চোরাচালান ও গো-পাচার কি চলতেই থাকবে?

(৪) লক্ষাধিক ব্যক্তি কি চিরকাল অনাগরিক হয়েই থাকবেন?

মনোমোহন রায়, কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি, জলপাইগুড়ি।

মাওবাদী দমনের নামে পার্টিরাজ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

গদাধর সিং

লালগড় তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে হিংসা, খুন, বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, লুট ইত্যাদি নানা অশান্তির একমাত্র কারণ ৩২ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসন। জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা কিন্তু শিশু মহিলা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালায় না। কেবলমাত্র ব্যভিচারী কমরেডদের এবং তাদের রক্ষাকারী পুলিশকে মারার লক্ষ্য নিয়ে তারা বর্তমানে চলেছে। লালগড় ও জঙ্গলমহলের মানুষ আজ অস্ত্র ধরতে বাধ্য হল কেন? জঙ্গলমহলের কালো চামড়ার মানুষ ও আদিবাসী মানুষ গত ৩২ বছরে কোনও উন্নতির আলো দেখতে পায়নি। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে তারা দেখে আসছে কাঠ বিক্রি করে, শালপাতা সেলাই করে, বাবুই দড়ি পাকিয়ে, মহুল কুড়িয়ে, রহড়া-বহড়া ফল বিক্রি করে, শাল গাছ থেকে লাল পিঁপড়ের ডিম ঝেড়ে, শিমুলকন্দা, শকরকন্দার মূল সিদ্ধ করে খেয়ে দিনপাত করে আসছে। জঙ্গলের ফাঁকে খাল-বিলে, জোড়ের ধারে অল্প কিছু জমি তৈরি করে গড়া ধান বুনে দুই এক মাসের খাবার জোগাড় করে। আমলাশোলের মতো কত গ্রামে অনাহারে বিনা চিকিৎসায়, পানীয় জলের অভাবে পাত-কুয়োর জল খেয়ে এখনও মানুষ মারা যায়। কাঁকড়াঝোর, ওদলচুয়া, বাঁশপাহাড়ী, বেলপাহাড়ী, ছেঁদাপাথর, বারিকুল, রানীবাঁধ, বাগমুন্ডি পাহাড় — এই সব দুর্গম অঞ্চলে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ওষুধ থাকে না। জলের ব্যবস্থা থাকে না রোগীদের জন্য শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই এলাকার মানুষ মুমূর্ষু অবস্থায় হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু বিক্রি করে বাঁকুড়া মেডিক্যাল হাসপাতাল, ঝাড়গ্রাম, বারিপাদায় চিকিৎসার জন্য যায়। সেখানে গিয়েও কালো চামড়ার বনবাসী মানুষ চিকিৎসায় সহযোগিতা পায় না, কোথায় কি পরীক্ষা করতে হবে তা জানে না। দালালদের হাতে পড়ে অর্থ ধ্বংস হয়ে যায়, শেষে খাওয়ার পয়সাটুকুও থাকে না।

এই জঙ্গলমহলের ছেলে-মেয়েরা বর্তমানে কিছু কিছু শিক্ষিত হচ্ছে। উন্নতির আশায় চাকুরির লক্ষ্যে নানা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসছে, শেষে সব কিছু হয়ে যাওয়ার পরও পার্টির চ্যানেল, ঘুষ, এছাড়া বাড়তি প্রাপ্য পুলিশের লাথি, লাঠি, ডাণ্ডা, গালি ও গুলি। এলাকার মেয়েরা, বিবাহিত মহিলারা যারা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে, অথচ তারা কাজ পায় না। অঙ্গনওয়াড়ীর শিক্ষিকা, সুপারভাইজার পদে কাজ পাচ্ছে কমরেডদের বাড়ির মেয়ে-বৌ-রা। ইন্দিরা আবাস বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বিপিএল সুবিধা কি —এগুলো এখনও লালগড়ের মানুষ জানতে পারে না। ১০০ দিনের কাজের টাকা এখনও তারা পায় না, কারণ ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাই। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা বর্তমানে মৌলিক অধিকারটুকু পাওয়ার জন্য আন্দোলনমুখী হয়ে পড়েছে। নানান রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে দীর্ঘদিন এই দাবী করে আসছে, কিন্তু এই বামফ্রন্ট রাজত্বে তার সদুত্তর তারা পায়নি। এই শাসক দল কখনও পুলিশ দিয়ে কখনও হার্মাদ বাহিনী দিয়ে এই নেতৃত্বকে হত্যা করেছে, বাড়ি লুট করেছে, জমি দখল করে নিয়েছে, আন্দোলনকারীদের জেলে পাঠিয়েছে। বিনা বিচারে আটক করছে। গত বছর নভেম্বর মাসে শালবনীতে জিন্দাল কোম্পানীর কারখানার শিলান্যাস করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেববাবুর কনভয়কে লক্ষ্য করে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ প্রশাসন তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে গভীর রাত্রে ছোটপেলিয়া গ্রামের মহিলা এবং স্কুলছাত্রদের মাওবাদী তকমা লাগিয়ে নির্মম অত্যাচার চালায়। এক মহিলার চোখ নষ্ট করে দেয়। তার প্রতিকার কীভাবে হবে? সে দিন থেকে গড়ে উঠে 'পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'। কমিটির নেতা দিচ্ছেন ছত্রধর মাহাত। পুলিশ মন্ত্রী ভেবেছেন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে লালগড় অভিযানে বিজয়পতাকা ওড়াবেন।

মাওবাদী দমন অভিযানের নামে

জনমত

পরিকল্পিতভাবে বিরোধীদের খতম করতে মাস্টার প্ল্যান করেছেন। যারা দু 'মুঠো অন্ন দিতে পারে না, তারাই এই সভ্য সমাজে থেকে কুলডিহা গ্রামের গৃহবধূ উষারাণি সিং ও তার ছোট মেয়ের ভাতের থালা লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। বুড়ো মানুষদের, অসুস্থ মানুষদের বেলপাহাড়ী, চাকাডোবা, নেগুড়িয়া গ্রাম থেকে টেনে বের করে পিটিয়ে গুঁতো মেরে কথা বের করার চেষ্টা করছে। বুদ্ধবাবু তাঁর পুলিশ বাহিনী দিয়ে জনসাধারণের উপর পাশবিক অত্যাচার শুরু করেছেন।

আগামী বিধানসভা ভোটে জয় নিশ্চিত করতে বিরোধী গ্রামগুলো চিনিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে সিপিএমের ক্যাডার ও হার্মাদ বাহিনীর লোকজন। মাওবাদী নাম দিয়ে এই গ্রামগুলোর যুবকদের জেলে পোরার চেষ্টা চালাচ্ছে। আসলে সিপিএমের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষ আর নেই। পিঠে দেওয়াল ঠেকে গেছে। এন ডি এ সরকারের সময় থেকে এই সব অঞ্চলে দু-তিন কিলোমিটার অন্তর পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। তাই আজ অস্ত্রের জবাব দেওয়ার জন্য মাওবাদীদের কবলে পড়ছে জঙ্গল মহলের মানুষ। বনাঞ্চলের মানুষ খুবই শান্ত, অল্পে সন্তুষ্ট। দীর্ঘদিনের অত্যাচারের কারণে আজ উগ্র হতে বাধ্য হচ্ছে। কোনও সভ্য জাতি মা-বোনদের উপর অত্যাচার কোনওদিন মেনে নিতে পারে না। বামফ্রন্ট সরকারের ৩২ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত আক্রোশ ও ক্ষোভের কারণে সিপিএমের পার্টি অফিস ও নেতার বাড়ি জ্বলেছে।

অব্যাহত জাতিদাঙ্গা, সন্ত্রাসবাদ

(৯ পাতার পর)

মিজোরামে সক্রিয়। তাদেরও দুটি গোষ্ঠী মার পীপুলস্ কনভেনশন এবং মার পীপুলস্ কনভেনশন (ডি)। সশস্ত্র মার জঙ্গিরা খোদ হাফলং-এ ডিমাসা বসতি আক্রমণ করে। কাছাড় জেলার দুটি গ্রাম-চেকারচাম ও মেটনাথল-এর সবকটি ডিমাসা জনজাতিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় একেবারে সাধারণ নিরীহ ডিমাসারা কাছাড় জেলার চারটি ত্রাণশিবিরে দীর্ঘদিন আশ্রয়ে ছিল। তখন কেবলমাত্র বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যথাসাধ্য তাঁদের সহায়তা করেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর তৎকালীন শিলচর বিভাগ সঙ্ঘচালক মিহির রায় এবং ডিমাসা নেতা ও শিলচরবাসী প্রবীণ সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ্ শোণিত বর্মণের চেষ্টায় ডিমাসারা বেশ কিছুটা আশার আলো দেখেছিল। ২০০৩-এর ২৮ নভেম্বর করিমগঞ্জে এক জনসভায় তৎকালীন আর এস এস প্রধান সুদর্শনজী খৃস্টান মারদের দ্বারা হিন্দু ডিমাসাদের ওপর আক্রমণ ও হত্যালীলার কঠোর সমালোচনা করেন। সেবার পঞ্চাশটির মতো ডিমাসা গ্রাম জ্বালানো হয়েছিল।

এবার ৩৫ জন হিন্দু ডিমাসা খৃস্টান জঙ্গিদের হাতে এখনও পর্যন্ত নিহত। ২০/২৫ টি-রও বেশি গ্রাম জ্বালানো হয়েছে। ত্রাণশিবিরে অনেক ডিমাসারা আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের কাছে গিয়ে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিয়েছেন আর এস এস ও কেশব স্মারক সমিতির স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা।

খৃস্টান চার্চ মদতপুষ্ট ও খৃস্ট উগ্রপন্থী গোষ্ঠী এন এস সি এন ও ডি এই ডি (গার্লোসা) এর দ্বন্দ্বের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন হিন্দু ডিমাসারা এবার ডিমাসা সমাজকেই ঠিক করতে হবে অবশিষ্ট সমাজের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিদের বিচ্ছিন্ন করবেন কিনা। আদতে ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে উগ্রপন্থীরা কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। আর পরস্পর লড়িয়ে দিয়েছে হিন্দু নাগা ও হিন্দু ডিমাসাদের। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পরস্পর দাঙ্গা ও হত্যালীলা অব্যাহত।

তিন রামায়ণের কথা

কিরণশঙ্কর মৈত্র

।। ৩ ।।

শতাব্দীকাল পূর্বে ভারতের রামায়ণ — কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে — শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা, ভূটান, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো, কম্বোডিয়া প্রমুখ দেশে। স্বেচ্ছায় বহু দেশ গ্রহণ করেছিল ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প এবং এসব কিছুর প্রতিফলন ঘটেছিল সেই দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। এগুলি এখনও অঙ্কোরভাটের মন্দির, ইন্দোনেশিয়ার ছায়া-পুতুল নাচ থেকে কান্দাহারের ফ্রোস্কো-চিত্রে প্রতিবিম্বিত।

থাইল্যান্ডের খোন-রামায়ণে ভারতীয় রাম-কাহিনী গৃহীত হয়েছিল তিন-চার শতাব্দীকাল পূর্বে। সেই থাই খোন রামায়ণের সর্বপ্রথম শো' হল ভারতবর্ষের উত্তর রাজস্থানের প্রত্যন্তে ছোট শহর, বিওয়ার-এ। আজমীর থেকে ৬০ কিমি দূরে এই শিল্প-শহরে পাওয়া যায় প্লাস্টিক দ্রব্য, টেক্সটাইল,

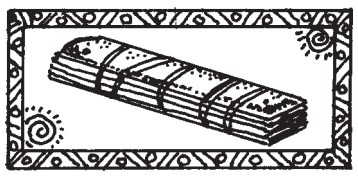

সনাতনী শিক্ষা

কাঠের ফার্নিচার, সিমেন্ট ও মেসিন ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। উত্তর ভারতের অন্য ছোট শহরের মতো এখানেও গ্রামীণ ও আধুনিক জীবনের মিশ্রণ, রাস্তায় বলদ-টানা দ্বিচক্র যানের সঙ্গে দ্রুতগামী আধুনিক মোটরগাড়ি, লম্বা ঘোমটা টানা গ্রামীণ রমণীর পাশে জিন্‌স স্কার্টস পরা মেয়েরা, সাইকেলকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে দ্রুত সশব্দ ধাবমান মোটর বাইক।

রাজস্থানের এই বিওয়ার শহরে ফেব্রুয়ারি মাসের (২০০৮) প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল থাইল্যান্ডের খোন রামায়ণ, প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের সামনে। রামায়ণের বহু চরিত্রের নাম এই রামায়ণে নতুন, যেমন রাম হয়েছেন 'ফ্রারাম', সীতা 'সিডা', রাবণ 'তোসক নাথ', শুধু তাই নয়, অযোধ্যা 'অয়ুথিয়া'। উল্লেখ্য — খোন রামায়ণে অসুর এবং বানরদের মুখে রয়েছে মুখোশ। মানব ও দেবতাদের মাথায় অলঙ্কৃত মুকুট। থাই ভাষায় 'খোন' শব্দের অর্থ মুখোশ।

রাজস্থানের দর্শকেরা অনেকেই থাই ঐতিহ্যের মর্ম অনুধাবন করতে পারেননি, অনেকেই বুঝতে পারেননি ভাষা, স্বতঃই তারা মন্তব্য করেছেন — "য়ে ক্যা উলট পুলট কর্ রহে হ্যায়", "হামারি রামায়ণ তো জাদা আচ্ছি হ্যায়"। ইয়ে পতা নঁহি ক্যা গায়ে জা রহে হ্যাঁয়, ঘর চলেঁ?"

স্পষ্টতই আমাদের রামায়ণকে ভিত্তি করে প্রস্তুত থাই 'রামাকিয়েন, অনেক ক্ষেত্রে আলাদা রূপ পেয়েছে। ঐশ্বর্যময় এই রামাকিয়েনের পোশাক-পরিচ্ছদ মস্তকভূষণ প্রস্তুত করতে মাস খানেক সময় লাগে, খরচ থাই মুদ্রায় ২০ মিলিয়ন বাহ্‌ৎ (৬,৫০,০০০ হাজার ডলারের সমতুল)। (থাইল্যান্ডের) Sala Chalermkring রয়াল থিয়েটারের ডিরেক্টর জানান তাদের মূল রামায়ণের সময়সীমা ছিল চার ঘন্টা, সেটি হ্রস্ব করে তারা সীমিত করেছেন এক ঘন্টা পনের মিনিটে। ব্যাঙ্ককের এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে প্রতিষ্ঠাতা থাই রাজা সপ্তম রামরা। তিনি চেয়েছিলেন তার প্রজারা এখানে আধুনিক চলচ্চিত্র উপভোগ করুক। কিন্তু আজ থিয়েটার খোন রামায়ণের নাট্যমঞ্চ ।

পরম্পরা

গুরু এখন 'স্ট্যাটাস সিম্বল'

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক। এ এক আপ্তবাক্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বাক্যবন্ধনেরও ঘটেছে রদবদল। পরিবর্ত লবজু — চেলা মিলে লাখ লাখ, গুরু মিলে এক। একটু বিশদে গেলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। গুরু হলেন ইহ জীবনের শান্তি দাতা, পরজীবনের পরিত্রাতা, দিগ্‌নির্দেশনও। গুরু হলেন পরমাত্মা আর আত্মার সংযোগমাধ্যম। গুরু সেই পরমেশ্বরেরই রূপভেদমাত্র। তিনি সেই আদিগুরুর প্রতিরূপ অথবা প্রতীক। তিনি নিজে কোনও মন্ত্র দেন না, দীক্ষা দেন না। তিনি যা করেন সবই তাঁকে নিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়। করিয়ে নেন আদিগুরু। তাঁরই প্রতিনিধির ভূমিকায় থাকতে হয় গুরুকে।

তন্ত্র মতে, যে কেউ গুরু হতে পারেন না। বিশেষ কিছু গুণ থাকলেই বসা যায় গুরুর আসনে । গুরু হবেন শান্ত, দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, তপস্যার কষ্টসহিষ্ণু, সদ্‌বংশীয়, বিনীত, শুদ্ধাচারী, শুদ্ধবেশ, সুবুদ্ধি সম্পন্ন এবং তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ। অন্যকথায় তিনি হবেন শাস্ত্রজ্ঞ। গুরুই হলেন ইষ্টদেব। তিনিই দেবতা। তিনি সামনে থাকলে অন্য দেবতার পূজার দরকার পড়ে না। তিনি তুষ্ট হলেই তুষ্ট হন দেবতা।

কিন্তু গুরুগিরি যখন থেকে হল জীবিকা, ব্যবসাও তখন থেকেই ঘটতে থাকে অবনমন। সব অর্থেই। একটা সময় এল, যখন গুরু শুধু উপার্জনের স্বার্থে নানা বিধান দিতে শুরু করলেন। আরোপ করলেন নানা ধরনের বিধি-নিষেধ। কায়েম হয়ে বসল কিছু সংস্কার — সোজা কথায় যাকে বলা যায় কুসংস্কার। তার চেয়েও লজ্জার, দেবতার আসনে বসে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আশ্রয় নিলেন, প্রশ্রয় দিলেন অবাধ যৌনাচারের। সব মিলিয়ে গুরু ব্যবসায় যুক্ত হল একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। সে অধ্যায় গুরুকে গুরু হবার জন্য কোনও গুণের অধিকারী হতে হয় না, কোনও তপস্যার ক্লেশ বহন করতে হয় না। জন্মাধিকারেই গুরুর পুত্র হলেন গুরু। তারপর তাঁর পুত্র, তাঁর পুত্র এবং ওই এক ধারাবাহিকতা।

এই ধারাবাহিকতায় আবার একটা সময় এল পরিবর্তন। কুলগুরুর পরিবর্তে সাধকগুরু। সন্ন্যাসী গুরু। ব্রহ্মচারী গুরু। সেক্ষেত্রেও আবার আরেক বিপর্যয়। দলে দলে মানুষ শিষ্য হতে থাকল। তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির আশায় ভিড় জমাতে থাকল মানুষ। লোককল্যাণে, জনহিতে গুরুও হলেন অবাধ। অকাতরে সকলকে দিতে থাকেন দীক্ষা। ফলে বাড়তে থাকে শিষ্যের সংখ্যা। কিন্তু সেই শিষ্যের দল বেশির ভাগ সময়েই সাধনার পথে না গিয়ে, সবকিছু চাপিয়ে দিতে থাকেন গুরুর উপরে। ফলে জাগতিক নিয়মেই সেই গুরুর দেহত্যাগের

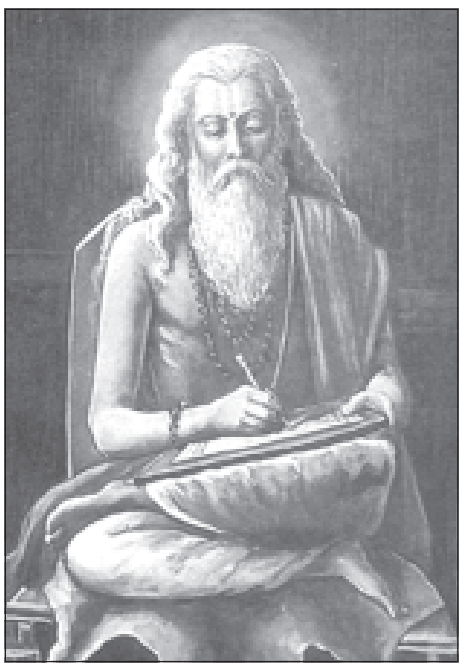

পর দেখা দেয় এক শূন্যতা। গুরুর আসনে বসার মতো যোগ্য উত্তরাধিকারী পাওয়া ক্রমেই দুর্ঘট হয়ে উঠল। ঐহিক সুখের কামনায় আসা ও শিষ্যদানের মধ্যে কদাচিতই প্রকৃত বেলা বা উত্তরসাধকের সন্ধান পাওয়া যেতে থাকল। ফলে এক অর্থে গুরুর চেয়েও প্রকৃত চেলার মর্যাদা বাড়তে থাকল।

বর্তমানে এই গুরুবাদে এসেছে আরেক ধরনের পরিবর্তন। বিবর্তনের সে ধারায় চেলা হবার মতো শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকল অতিদ্রুত, অন্যদিকে প্রকৃত গুরুর সংখ্যা হল ক্ষীয়মান। গুরুর আশ্রয়ে থেকে চেলা হওয়া নয়, বহু সময়ই চেলার আশ্রয়ে থেকে রমরমা ঘটছে গুরুর।

বড় ছিন্নমস্তা এ সময়। এই সময়ে শিষ্যের কাছে গুরু হয়ে উঠছেন একটা সামাজিক মর্যাদার প্রতীক বা একটা 'স্ট্যাটাস সিম্বল'। শিষ্যই তখন গুরুকে তার বা তাদের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের বাসনায় নয়, ব্যবসায়িক জগতে বেশ বড় সড় দাঁও মারার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এখন গুরুদের, বহুবারই। চেলা বা শিষ্যরাই গুরুতে আরোপ করছে নানা মাহাত্ম্য। গুরুর নামে প্রচার করতে থাকে নানা অলৌকিক কাহিনী। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হতে থাকে সেসব প্রচারে। দলে দলে শিষ্য হয় তারা। স্ফীত হয় প্রণামীর পাত্র। সেই অর্থে সেই সব চেলা যাপন করতে থাকে এক বিলাসবহুল জীবন। তারপর প্রণামীর ভাগ নিয়ে কলহ। কখনও বা হত্যাও। এক থেকে দুই, তার থেকে আরও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের উদ্ভব।

বাস্তবে, সংকট দেখা দিয়েছে প্রকৃত গুরুর। লোক কল্যাণে যে অল্পসংখ্যক সাধক নেমে আসেন সমতলে, তাঁদের কাছে 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা'। ফলে তাঁদের সম্পর্কে তথাকথিত ওইসব চেলা মহারাজদের আগ্রহ প্রায় নেই-ই বলা চলে। প্রচার সর্বস্ব এই যুগে প্রচার না থাকায় এইসব সাধক গুরু মানুষের জানাশোনার বাইরেই থেকে যান প্রায়শই। ফলে লাখ লাখ চেলা মিললেও প্রকৃত সেই গুরুর সন্ধান পাওয়া রীতিমতো কঠিন এক ব্যাপার।

বর্তমানে প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিষ্যরাই 'গুরু' বানাচ্ছে। সেই বানানো গুরুকে নিয়ে প্রচারের ফানুস ওড়াচ্ছে আকাশে। অসহায় গুরু তার কোনও প্রতিবাদ করছেন না। ফলে চেলাদের বাড়-বাড়ন্ত। কখনও গুরুকে নিয়ে সরাসরি ব্যবসা। কখনও গুরুর মাহাত্ম্য-কীর্তন করে সামাজিক মর্যাদাকে বাড়িয়ে নেওয়া। উচ্চবিত্তদের ক্লাব-কালচারেও এখন গুরু নিয়ে চলে নানা আলোচনা। কার গুরু কত বড় — এই নিয়ে রীতিমতো দ্বৈরথের সম্ভাবনাও দেখা দেয়।

সব মিলিয়ে প্রকৃত গুরুকে আড়াল করে চলেছে চেলা-বাবুদের রমরমা। ধর্মের নামে চলছে রাজনীতি, এবং ব্যবসাও। গুরু পূর্ণিমার দিনে সেই আমি গুরুকে প্রণাম জানিয়েই ডাক দিতে হয় মানুষকে — খতম কর গুরু ভণ্ডামিকে। তথাকথিত চেলা-নির্মিত গুরুকে বাদ দিয়ে শরণ নাও প্রকৃত সাধক গুরুর। তাহলেই মুক্তি। তাহলেই শান্তি এবং নিরাপদ সরল এবং প্রতীক গুরুরও দেবত্বে উত্তরণ।

ভক্তাধীন ভগবান

নিষাদ ভক্ত বাঁকো

পুরুষোত্তম স্বামী

বন্দ কর দৃষ্টিকো ফের অন্দর করৈ,
ঘটকা পাট গুরুদেব খোলৈ।
কহত কবীর তু দেখ সংসার মে
গুরুদেব সমান কোই নঁহি খলৈ

—সন্ত কবীর

দৃষ্টি যার বদ্ধ বহির্মুখী, গুরুই দেন তাকে অন্তরমুখী করে। ইহ সংসারে তাই গুরুদেবের সমান নেই কেউ। তাঁর সঙ্গ সৎসঙ্গ। তাঁর বাণী ঈশ্বর বাণী। তাঁর দর্শন-স্পর্শন শ্রীহরিরই দর্শন-স্পর্শন। তাঁর কৃপায় জীবন হয় স্বর্ণময়।

মহাত্মা কবীরের এই বাণীর রূপবিগ্রহ মূর্ত হয়ে ওঠে অজ্ঞান, অবোধ, নিরক্ষর ভীল নিষাদ যুবক বাঁকোর জীবনে। বলা যায় নিজের অজান্তে, অভ্রান্তভাবে।

গুজরাটের প্রসিদ্ধ নগরী আমেদাবাদের অদূরে রেবা-কঁঠা রানাদোদ জনপদের প্রান্তসীমায় বংশানুক্রমিক বাস বনবাসী বাঁকোর পরিবারের। পারিবারিক জীবিকা কিরাতবৃত্তি অর্থাৎ শিকারীর জীবন গ্রহণ করেছিল বাঁকো। সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি উপশমের জন্য। অর্ধাহার, দারিদ্র্য কবলিত হওয়া সত্বেও সরল সাধাসিধে জীবন-যাপন করত সে। শহুরে সভ্য মানুষদের মতো জটিলতা, কু-প্রবৃত্তি তাঁর মনের অলিন্দে অলিন্দে বাসা বাঁধেনি। উদ্বেগহীন অন্তর জুড়ে থাকত প্রশান্তি আর প্রাণময়তা। দৈনন্দিন জীবনচর্যায় ছিল শিকারের আশায় ভোর হতেই বনে ঘুরে বেড়ানো। সন্ধ্যায় ফেরা কখনও খালি হাতে, কখনও বধ করা পশুর প্রাণহীন দেহ নিয়ে।

কিন্তু পঞ্চ দশ শতকের শেষ ভাগের সেই দিনটি বাঁকোর জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকে। শিকার সন্ধানে বেরিয়ে সেই-ই হয়ে যায় আর এক শিকারীর শিকার।

সেই শিকারী হলেন সন্ত কামাল। একাধারে পিতা ও গুরু সন্ত কবীরদাসের আদেশে তিনি বেরিয়েছেন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে মোহমুক্ত করতে। গুরু কবীরদাসের আদেশ ছিল — "চোর্যাসীসে জীব মোক্তাও'। অর্থাৎ দেশ দেশান্তরে গিয়ে মানুষদের মায়ামোহ মুক্ত করো। তাদের সংস্কার করো।

অযোধ্যার সীতাপুর, গুজরাটের পাটান হয়ে পৌঁছলেন কামাল সাহেব আমেদাবাদে। সেখানে তিনি দরিয়া খান নামে এক পাঠান মুসলমানসহ ৬০ জনকে সন্ন্যাস দিলেন। ঘটনায় আমেদাবাদে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিনি আমেদাবাদের নবাবের কোপে পড়েন। নবাব কামালের বিপক্ষে দূত পাঠান কাশীতে কবীর দাসের কাছে। অভিযোগ পত্র সহ। এরপর সন্ত কামাল আমেদাবাদে আর থাকেননি।

চললেন রেবা-কঁঠা রনাদোদ জনপদের দিকে। জঙ্গলের পথে সন্ত কামালের চোখে পড়ে দূর থেকে। এক শিকারীর কাঁধে বড় হরিণের রক্তাক্ত দেহ। হরিণের রক্তে তার সুঠাম দেহ প্লাবিত। শিকারী কাছে আসতেই শিকারীর রক্তাপ্লুত দেহ দেখে শিউরে ওঠেন কামাল সাহেব। কেঁপে ওঠে দয়ালু হৃদয়। গম্ভীর কণ্ঠে তাকে থামিয়ে বলেন — ওরে পাপী, কেন তুই নির্দোষ প্রাণীকে প্রাণে মারলি। ও তোর কি ক্ষতি করেছে, যার জন্য ওকে বধ করলি।

— বাবা এই হরিণের মাংসে আমার পরিবারের ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে। কয়েকদিন অভুক্ত আমরা — সরলভাবে সাদা মনে উত্তর দেয় শিকারী। পাপ-পুণ্য, দয়া-মায়ার বিষয় তার তো অজানা।

কিরাতের কথাগুলি শেলের মতোর বেঁধে সন্ত কামালের সংবেদনশীল হৃদয়ে। করুণা হয় তাঁর সরল, অজ্ঞানী, নির্ভীক ভীল যুবকের প্রতি। জিজ্ঞাসা করেন — শিকারী, কি নাম তোর। কি পরিচয়। পথে দেখা তোর সাথে। না জেনে চলে যাই কি করে।

শিকারীর সরল উত্তর — বাবা, আপনার সাথে পরিচয় নেই আমার। এদেশে সকেলই চেনে আমাকে। নাম বাঁকো। ভাল শিকারী বলে আমার নাম-

(এরপর ১৫ পাতায়)

কর্মফল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গ্রামে তখন মহাভোজ। কাতারে কাতারে লোক জমছে। সব ব্যবস্থা কাল রাতেই সারা হয়েছে। গ্রামের লোকেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করাও হয়ে গেছে। মালিক ভাগোর নিমন্ত্রণ বলে কথা! মালিকের অবস্থা মন্দ নয়। গ্রামের একমাত্র ধনী তিনি। গ্রামের মস্ত বড় অট্টালিকাটি তাঁরই। এই গ্রামে তাঁর মতো ধনী আর দ্বিতীয়টি নেই। ধন-দৌলত যা রয়েছে, তাতে চৌদ্দ-পুরুষও বসে খাবে। কাল রাত্রিতেই মালিকের নির্দেশে সব ব্যবস্থা সেরে ফেলেছে কর্মচারীরা। ভোর ভোরই রান্না শেষ করে ফেলেছে ঠাকুর। দুপুর থেকেই গ্রামবাসীরা আসতে শুরু করেছে। চারদিকে বড় প্যান্ডেলে বসানো হয়েছে তাদের। মালিক নিজেও সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখছেন। গ্রামের যাতে কেউ বাদ না যায়, সেদিকেও তীক্ষ্ন নজর রয়েছে তাঁর।

ভোজন পর্ব শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যে গড়িয়ে এল। গ্রামের কেউ বাদ থেকে গেছে কিনা জানতে মালিক ভৃত্যকে ডেকে পাঠালেন। ভৃত্য অবিলম্বে গলায় গামছা জড়িয়ে হাজির হল। মালিক স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, নির্মল, 'গ্রামের কেউ বাদ গেছে কিনা তুমি দেখছ'। নির্মল এই বাড়ির সব থেকে পুরনো কাজের লোক। মাথা নীচু করে উত্তরে বললেন, 'বাবু, সবাই ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরেছে। কারও কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু গ্রামের রামো আসেনি খেতে, রামোর বাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, তিনিও আসেননি এখানে। মালিক একথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। লাঠিয়ালকে ডেকে রামোকে ধরে আনার আদেশ দিলেন। লাঠিয়াল কিছুক্ষণ পরেই রামো ও তার গুরু মহারাজকে ধরে আনলেন। রামোর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। গম্ভীর

বোধ কথা

কণ্ঠে মালিক বললেন, রামো তোমার কি হয়েছে? গ্রামের সবাই খেয়ে গেল আর তুমি? রামোর উত্তর দেওয়ার আগেই সেই সন্ন্যাসী বললেন, মালিক, আমিই তোমার কাছে আসতে চাইনি। ও সেই কারণেই আসেনি। মালিক উত্তরে কিছু না বলে, নির্মলকে খাবার আনার জন্য ইসারা করলেন। নির্মলও ইসারা বুঝে হরেক ব্যঞ্জনের খাবার নিয়ে হাজির হল। মহারাজ হাসতে হাসতে থালাটা কাছে টেনে নিলেন। এরপর রামোকে ডেকে তিনি তার বাড়ি থেকে দুটি রুটি নিয়ে আসতে বললেন। রামো সন্ন্যাসীর কথা মতো তার বাড়ি থেকে দুটি রুটি নিয়ে হাজির হল। সন্ন্যাসীর এঘটনায় মালিক হতবাক। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। মহারাজ দু'হাতে দুটি রুটি তুলে একটি একটি করে টুকরো করতে লাগলেন। তারপর দুটো রুটির টুকরো আলাদা আলাদা দুটো থালায় রাখলেন। রুটি দুটো একটা রামোর বাড়ি থেকে আনা, অন্যটা মালিকের। কিছুক্ষণ পর সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। রামোর বাড়ি থেকে আনা থালায় ক্রমশ দুধ জমতে থাকছে। আর অন্যটিতে গাঢ় রক্ত। মালিক সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ, এটা কেন হচ্ছে? মৃদু হেসে সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, দেখ মালিক, তোমার থালায় ক্রমশ রক্ত জমছে। কিন্তু রামোর থালায় দুধ। এর কারণ কী জান। তুমি এতদিন যা যা করেছ, তারই ফল এটা। এতদিন প্রবঞ্চ না করে তুমি বড় হয়েছ। মানুষকে ঠকিয়েছ। কিন্তু রামো সৎ, ন্যায়পরায়ণ। ওর থালাতে সে কারণে দুধ জমছে। কিন্তু তোমার থালায়! মালিক বুঝলেন, সন্ন্যাসীর কথার অর্থ। মানুষকে ঠকিয়ে বড় হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া যায় না।

ঘটনাটা সত্য। মনে হতে পারে অবাস্তব। মহারাজ আর কেউ নন। স্বয়ং গুরু নানক। ঘটনাটা তাঁর চলার পথেরই এক গ্রামের।

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ৯

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

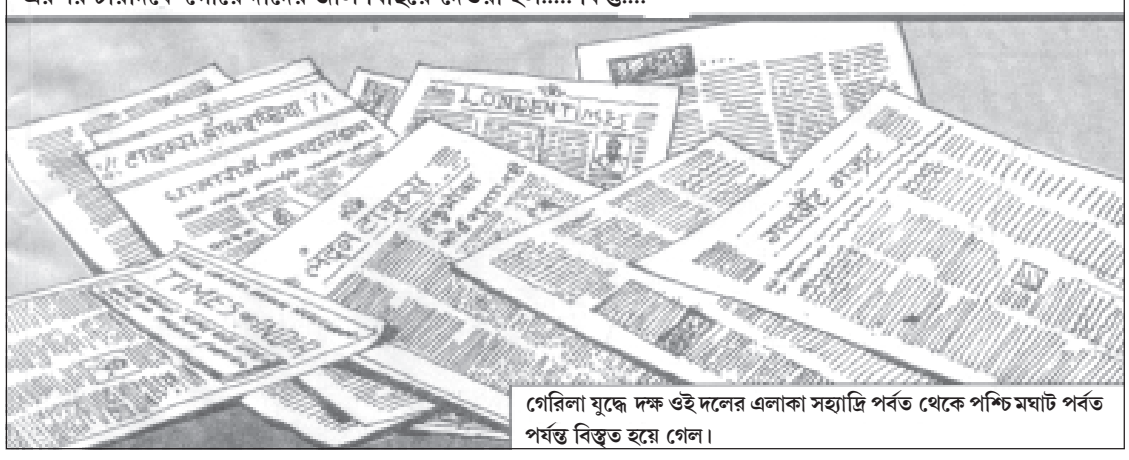

শৈশবে রবীন্দ্রনাথের মাথায় এক উদ্ভট খেয়াল চেপেছিল। ফুলের রসে তিনি কবিতা লিখবেন। সুতরাং বাগান থেকে তুলে আনা ফুল টিপে টিপে রস বের করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এত সামান্য রস বেরল যে, তা কলমে লাগল না। এবার ঠিক করলেন, একটি ছেঁদাওয়ালা কাঠের বাটিতে ফুল রেখে তার ওপর নোড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলের রস বের করবেন। ছুতোর ডাকিয়ে পরিকল্পনা মাফিক যন্ত্রটা তৈরি করলেন। কিন্তু যতই ফুল পেষাই হতে লাগল, ততই কাদার মতো হয়ে গেল — ফুলের রস আর বেরল না। শেষ পর্যন্ত ফুলের রসে কবিতা লেখার আশা ত্যাগ করে কালির কলমই ধরতে হল কবিকে।

●●●

১ এপ্রিল ফ্রান্সে নতুন বছর হত। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তা পাল্টে ১ জানুয়ারি করা হয়। কিন্তু কিছু লোক সে খবরে বিশ্বাস না করে ১ এপ্রিলই নতুন বছরের উৎসব করল, আর তাই দেখে অন্যরা তাদের নাম দিল 'এপ্রিল ফুল'।

●●●

বিশ্ব সাহিত্যে প্রথম লাঠিচার্জের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণে। সীতা উদ্ধারের পর সীতা যখন রামের কাছে আসছেন, সেই সময় বানর ও রাক্ষসদের ভিড় সামলাতে হিমসিম বিভীষণ তার রক্ষীদের লাঠিচার্জের আদেশ দেন। পরে রামের নির্দেশে সেই লাঠিচার্জ বন্ধ হয়।

●●●

কলম্বোর ছোট্ট গ্রাম ওয়েপনামাদুয়ার এক কিশোরী ছোটবেলা থেকেই নিজের মাথার চুল টেনে টেনে মুখে পুরে চিবাতো। এই বদভ্যাসই শেষ পর্যন্ত কাল হল ১১ বছরের মাদাওয়ান ভানমাদির। পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্রে চুল জমে মারা গেল। পেট ব্যথা, বমি এবং অন্যান্য উপসর্গ বাড়তে বাড়তে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। রোগের নাম ট্রাইকোফেজিয়ার। অস্ত্রোপচার করে ছ'শো গ্রাম চুল উদ্ধার করে ডাক্তাররা।

●●●

ত্রয়োদশ শতকে আরবের প্রখ্যাত কবি ইবন এল আবরার একবার এমন এক কবিতা লিখলেন, যা পড়ে তিউনেশিয়ার এক ব্যক্তির মনে হল, কবিতাটি তাঁকে নিয়ে লেখা এবং অত্যন্ত মানহানিকর। সুতরাং অভিযুক্ত কবিকে আদালত এই মর্মে দন্ড দেয় যে, হয় তাঁকে প্রকাশিত সব কবিতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে, নচেৎ স্বয়ং কবিকেই পুড়ে মরতে হবে। বলা বাহুল্য, কবি তাঁর সমগ্র কাব্যগুচ্ছ বাঁচিয়ে রেখে স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেন।

●●●

হল্যান্ডে যেসব কুকুর নিয়মিত ট্রামে-বাসে যাতায়াত করে তাদের জন্যও মানুষের মতো সাপ্তাহিক মাসিক বা বাৎসরিক টিকিট কাটার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া শিশুদের মতো অর্ধেক। ওই টিকিটে কুকুরের মালিকের নাম, কুকুরের নাম, ছবি এমনকী কুকুরের থাবার ছাপ আবশ্যিক।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

ছিনতাইবাজ — যা আছে চটপট বার কর, নইলে গুলি করে মাথার ঘিলু বের করে দেব।

পথিক — তাই দিন। এই কলকাতা শহরে ঘিলু ছাড়া বাঁচা যায়, কিন্তু টাকা ছাড়া বাঁচা যায় না।

☺ ☺ ☺

ছাত্র — স্যার, কাল কি স্কুল হবে?
শিক্ষক — কেন, কাল কী আছে?
ছাত্র — কাল বাংলা বন্ধ না!
শিক্ষক — বাংলা বন্ধ তো কী হয়েছে, অন্য সাবজেক্টগুলো পড়াব।

☺ ☺ ☺

পৃথা — বল তো ভূত আর ভগবানের মধ্যে তফাৎ কি?

মিতা — ভূত নেই, তবু দেখা যায় আর ভগবান আছে, তবু তাঁকে দেখা যায় না।

☺ ☺ ☺

— আমরা বিছানায় শুতে যাই কেন?
— বিছানা কাছে আসতে পারে না বলে!

☺ ☺ ☺

ডাক্তার — আপনার স্ত্রীর দেহের মেদ কমাতে যে রোলার ব্যবহার করতে বলেছিলাম, তাতে কাজ হয়েছে?

রোগী — হ্যাঁ, রোলারটা অনেক ক্ষয়ে গেছে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?

২। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট দল কত বছর পর নিউজিল্যান্ডের টেস্ট জিতল?

৩। হ্যারি পটারের প্যাঁচার নাম কী?

৪। Jiffy কীসের একক এবং তার পরিমাপ কী?

৫। ঘূর্ণিঝড় টুইস্টারের আর এক নাম কী?

— নীলাদ্রি

উত্তর ঃ
১। বান কি মুন
২। ৪১ বছর
৩। হেডউইগ
৪। সময়ের একক। ১ সেকেন্ডের ১০০ ভাগের এক ভাগ
৫। টর্নেডো

রায়পুরে রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের প্রশিক্ষণ শিবির

ভারতে মুসলিমরা নিজেদের সংখ্যালঘু বলে ভাবছেন কেন?

সংবাদদাতা ।। 'যারা দেশভাগ করেছিলেন তারা নবীর (রসুল) প্রতিনিধি ছিলেন না, তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানেরই আজ্ঞাবহ ছিলেন। বর্তমান ভারতে হিন্দুস্থানী মুসলমানরা সাচ্চা দেশভক্ত। মুসলিম মতানুযায়ী তাদের জন্য অবশ্যকরণীয় দুটি কাজের মধ্যে অন্যতম হল দেশপ্রেম বা দেশকে ভালোবাসা।' এই কথাগুলি বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকরী মন্ডলের সদস্য ইন্দ্রেশকুমার। সম্প্রতি রায়পুরে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চে র কর্মীদের তিনদিন ব্যাপী (৫,৬,৭ জুন) এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের প্রথম দিনে এক আলোচনাসভার বিষয় ছিল 'মজবুত হিন্দুস্থান কী বুনিয়াদ মেঁ মুসলিম সমাজ কী হিস্যেদারি'। এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইন্দ্রেশজী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রেশজী, জৌহর মিঞা, ডঃ রমণ সিং, সঙ্ঘের নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী এবং তনবীর আহমদ।

গত ৬ জুন দেশের একতা, অখণ্ডতা এবং সৌভ্রাতৃত্বকে পুষ্ট করার জন্য চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে কৃষিপ্রধান ভারতে উন্নতির অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে কৃষির মূলভিত্তি হিসাবে গোবংশ সংবর্ধনের জন্য রাষ্ট্রীয় গোবংশ প্রাধিকরণ এবং গো-অনুসন্ধান সংস্থান গঠনের দাবী করা হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কিত অন্য একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা, শিক্ষাসূচীতে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সমন্বয়, সমাজের পক্ষে যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক। অপর একটি প্রস্তাবে ১৯৪৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সংঘটিত তাবৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনুপুঙ্খ তদন্তের জন্য একটি বিচার-বিভাগীয় কমিশন গঠন করার দাবী করা হয়েছে। আর একটি প্রস্তাবে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা হত্যাকাণ্ডকে 'জেহাদ' বলার তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। ৭ জুন শিক্ষণবর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী। তিনি সারা দেশে ২২টি প্রদেশ থেকে আগত ২০০-র বেশি কার্যকর্তাদের পথ নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, ইসলাম-এর অর্থ শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব। এজন্য ইসলাম মতাবলম্বীদের শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা সর্বতোভাবে করা উচিৎ। তিনি আরও বলেন, স্বয়ং হজরত মহম্মদই আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সৌভ্রাতৃত্বের মাধ্যমেই একতাবদ্ধ করেছিলেন। তিনি প্রশ্নসূচক ভাষায় বলেন, ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা নিজেদেরকে সংখ্যালঘু বলে মনে করবেন কেন? তারা তো ভারতবর্ষের অভিন্ন অঙ্গ। সংখ্যালঘু তারাই যারা বাইরে থেকে এসেছেন। তাদের সংখ্যা অনেক কমই থাকে। সত্যিকার অর্থে ভারতে বসবাসকারী ইহুদী ও পারসিকরা সংখ্যালঘু। সুদর্শনজী বলেন, সব মত-পন্থেই দেশের সেবা করার কথা রয়েছে। ভগবান খোদা একই কথা। ধর্ম 'অনেকতা মেঁ একতার' কথা বলে। পৃথিবীতে ৫৬/৫৭ টি মুসলমান রাষ্ট্র রয়েছে। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

মঞ্চে বাঁ দিক থেকে ইন্দ্রেশকুমার, ডাঃ জোহর মিয়াঁ, রমণ সিং, কে এস সুদর্শন, তনবীর আহমদ।

শ্রীসুদর্শন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চে র প্রশংসা করে বলেন, এই মঞ্চ কয়েকজন উলেমা এবং দানীশ্বরদের পরস্পর সহমতের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। মঞ্চে র উদ্দেশ্য হল দেশে ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব, এবং সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বজায় রাখা।

এছাড়া তিন তালাক প্রথা সমাপ্ত করা, সমান নাগরিক আইন, রামমন্দির নির্মাণ, গরীব মুসলমানদের নিখরচায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, গোহত্যার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা, দেশভক্তির ভাব নির্মাণ এই মঞ্চে র মুখ্য উদ্দেশ্য।

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রমণ সিং-এবং জৌহর মিঞাও বক্তব্য রাখেন।

উপস্থিত ছিলেন মঞ্চে র সর্বভারতীয় সংযোজক মহম্মদ আফজল, রাষ্ট্রীয় সংরক্ষক তনবীর আহমদ, গিরীশ জুয়েল, সিরাজ কুরেশী, সহ-সংযোজক ইউনিস কুরেশী, সলাবৎ খাঁন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পুরো ব্যবস্থাপনা সামাল দেন মঞ্চে র ছত্তিশগড় প্রদেশ সংযোজক ডাঃ সেলিম রাজ। এই সম্মেলনে ইন্দ্রেশজীর বক্তৃতার সংকলন 'দেশপ্রেম এবং শান্তি কা সন্দেশ' শীর্ষক বইয়ের লোকার্পণ করা হয়।

রায়গঞ্জে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মাতৃশক্তি তথা নারীশক্তিকে জাগরণের অঙ্গীকার করেই সমাপ্ত হল পনেরো দিন ধরে চলা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণ শিবির। উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জের উদয়নারায়ণ বালিকা বিদ্যানিকেতনে অনুষ্ঠিত ওই শিবিরে পঞ্চাশ জন সেবিকা উপস্থিত ছিলেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন ওই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষিকা উৎসা চক্রবর্তী।

সেবিকাদের বৌদ্ধিক স্তর উন্নত করার পাশাপাশি শারীরিকভাবে যাতে তাঁরা আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। একদিকে শিবিরে মা সারদামণি, গৈরিক ধ্বজ, হিন্দুত্ব, মাতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয় যেমন আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমন বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম, যেমন — লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, সূর্যনমস্কার ও যোগাসনের শিক্ষাক্রমও রাখা হয়েছিল।

এইসব শিক্ষার ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ মায়া মিত্র বলেন, ''যে প্রশিক্ষণ আমাদের সেবিকারা এই শিবিরে পাচ্ছেন তা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবে যাতেতারা যে কোনও ধরনের জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা সহজেই করতে পারেন।''

এই শিবির অন্য এক অর্থেও তাৎপর্যপূর্ণ। সেবিকা সমিতির কার্যবাহিকা মহুয়া ধরের ব্যাখ্যানুযায়ী, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে দেখা যাচ্ছে, অনুপ্রবেশকারীদের হাতে পড়ে মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষাই এখন দায় হয়ে উঠছে। অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে একাজে মদত যোগাচ্ছে স্থানীয় মুসলিম দুষ্কৃতীরাও। এমতাবস্থায় নারীশক্তিকে দেবী দুর্গার শক্তিতে বলীয়ান করতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধিরও পরিকল্পনা করেছে সেবিকা সমিতি। সমিতির মতে, নিজ সাহায্যই সেরা সাহায্য (সেল্ফ হেল্প ইজ্ দ্য বেস্ট হেল্প) - এই আপ্ত বাক্যটাই গেঁথে দেওয়া দরকার সেবিকাদের মনে। যাতে তাঁদের নেতৃত্বেই সীমান্তের মা, বোনেরা অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে এই অসম লড়াই-এ সামিল হতে পারেন। সে কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল সেবিকা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রমুখ চিত্রা তাই-এর মুখে।

তিনি বলেছেন, ''সতর্কতাই উন্নতির চাবিকাঠি। আশপাশের এলাকার পরিবর্তিত পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এর মাধ্যমে মেয়েরা ও ছাত্রীরা শুধু যে সমাজের উন্নতি করবে তাই নয়, নিজেদের সুরক্ষিত রাখার বন্দোবস্তও করবে।''

শিবিরের অঙ্গ হিসেবে গত ২১ জুন এক পথসঞ্চ লন অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জ শহরে। ঘোষ (ব্যান্ড) সহযোগে তাদের এই পথসঞ্চ লন উৎসাহিত করেছিল স্থানীয় মানুষকে। শিবিরে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় অধিকারী সন্ধ্যা টিপ্রে, মুক্তিপ্রদা সরকার, প্রান্তসহ-কার্যবাহিকা রীতা চক্রবর্তী, রেখা পাল, কল্পনা সাহা, ভারতী দত্ত প্রমুখ। শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গয়ালাল গালর্স স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না রায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেবিকা সমিতির পরিকল্পনা ছিল অনুপ্রবেশ সমস্যা কবলিত বসিরহাটে ৩০ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত আরেকটি শিবির করার। কিন্তু গত ২৫ মে'র আয়লা তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। প্রায় পঞ্চাশ জন সেবিকার কাছ থেকে শিবিরে নাম নথিভুক্তকরণের শুল্ক গৃহীত হলেও তা বাতিল করতে বাধ্য হন সেবিকা সমিতির কর্তৃপক্ষ। কিন্তু উপস্থিত কতিপয় সেবিকা কলকাতা থেকে শুকনো খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ নিয়ে গিয়ে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান।

অবহেলায় মন্দিরগুলিকে নষ্ট করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদে

নবকুমার ভট্টাচার্য।। সাতাশ বছর সুলতানী রাজত্বে যেভাবে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক মঠ-মন্দিরগুলোকে ধবংস করা হয়েছিল ঠিক সেরকম না হলেও, এক অন্য কায়দায় মুর্শিদাবাদের মন্দিরগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হলেও এককালে এই জেলায় হিন্দু বসবাসও কম ছিল না। এই জেলায় রয়েছে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র কর্ণসুবর্ণ। বর্তমান নাম কানাসোনা। একসময় এখানেই ছিল মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী। কাছেই ছিল রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার। কথিত রয়েছে, এখানেই এসেছিলেন প্রসিদ্ধ চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ। সবই আজ ধবংসস্তুপে পরিণত। মুর্শিদাবাদকে ধীরে ধীরে কাশ্মীরের মতো অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এবং মৌলবাদীদের দাপটে সীমান্ত গ্রামের হিন্দুরা শহরে বহু পূর্বেই পালিয়ে এসেছেন। এবার তাদের সংস্কৃতির চিহ্নগুলিকেও মুছে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া চলছে।

ইতিহাসনগরী মুর্শিদাবাদের পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে নানা দ্রষ্টব্য। এদের মধ্যে হিন্দুদের অন্যতম পীঠস্থান কিরীটেশ্বরী মন্দির। একান্ন পীঠের অন্যতম হল এই মন্দির। কথিত আছে, সতীর কিরীটের এক কণা এখানে পতিত হয়েছিল। তাই এখানকার নাম কিরীটেশ্বরী। পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গল ও শনিবার এখানে মেলা বসে। কিন্তু যাওয়াটাই বিষম ব্যাপার। লিঙ্ক রোড ভাঙা চোরা অবস্থায় পড়ে আছে, যা যোগাযোগের একমাত্র উপায়। তাছাড়া সেখানে পর্যটকদের বিশ্রামের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু তার জন্য কারোর কোনও মাথা ব্যাথা নেই। অথচ পুজোর সময় থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে কয়েক লক্ষ পর্যটক আসেন। এই মন্দির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে রাজ্য সরকার কারোরই কোনও উদ্যোগ নেই। অথচ এখানে ভালো পর্যটন কেন্দ্র হতে পারতো। একই অবস্থা বড়নগরের ভবানীর মন্দিরের। চারচালার এই মন্দিরের টেরাকোটা শঙ্খের কাজ দেখার মতো। টেরাকোটার কাজের মধ্যে দিয়ে রামায়ণ - মহাভারতের কাহিনী খোদাই করা রয়েছে। রাজারাজেশ্বরীর মন্দিরটিও ভগ্নপ্রায়। বড়নগরের মন্দির থেকেই কয়েক বছর আগে চুরি হয়ে গেছে দামি মূর্তি। চন্দনবাটীর শিব মন্দিরও অবহেলার শিকার। কাশিম বাজার রাজবাড়ির মহামূল্যবান দলিল-দস্তাবেজও লোপাট হওয়ার পথে।

পরলোকে বিমলেন্দু সরকার

মালদহ নগরের পুরাতন স্বয়ংসেবক বিমলেন্দু বিকাশ সরকার — ডাক নাম বুলুদা গত ১০ জুন পরলোক গমন করেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে মালদহ নগরে যখন সঙ্ঘের কাজ শুরু হয় সেই সময় থেকেই বুলুদা সঙ্ঘকাজের পুরোভাগে থেকেছেন।

এক সময় সরকারি চাকরি ছেড়ে প্রচারক হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। ফিরে এসে ওকালতি পাশ করে ওকালতি জীবনেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি হিসাবে সক্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

তিনি স্ত্রী এবং এক কন্যা রেখে গেছেন। বিমলেন্দুদা বেশ কিছু পুস্তকও প্রণয়ন করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ৬ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলার জেলা সম্পর্ক প্রমুখ নিত্যানন্দ দত্ত তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কিঙ্কর দত্তের (প্রাক্তন প্রচারক) শুভ বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি হিসেবে ২০০১ টাকা প্রদান করেন। প্রান্ত কার্যবাহ, জেলা সঙ্ঘচালক ও বিভাগ প্রচারক প্রীতিভোজে উপস্থিত ছিলেন।

রঙ্গম

উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হচ্ছে বাচিক শিল্প

দীপেন ভাদুড়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর বহু কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। উদাত্ত কণ্ঠে নজরুলও ঘরোয়া আসরে অথবা স্টীমার পার্টিতে গানের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করেও শোনাতেন এবং উচ্চ প্রশংসিত হতেন।

প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন অথবা সূর্য প্রণাম করতেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করতেন সেটাও বাচিক শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন।

আবৃত্তি অর্থাৎ বাচিক শিল্পের কদর বহু বছর ধরেই রয়েছে। এখনও মনে পড়ে যায় নজরুল পুত্র কাজী সব্যসাচির কথা। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি আজও অমলিন। মনে পড়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তির কথা। এই স্বল্প পরিসরে আরও অনেকের কথা লেখা সম্ভব হল না। যাঁদের আবৃত্তি আজও সমান জনপ্রিয়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অথবা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর কোনওদিন অম্লান হবে না।

পাশাপাশি এই বাচিক শিল্প আরও উন্নত করতে অনলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন অনেক বাচিক শিল্পী, যথা গৌরী ঘোষ, শোভন সুন্দর বসু, পার্থ ঘোষ, কাজল সুর, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ বসু প্রমুখ। বহু বাচিক শিল্পীর কথা মনে পড়ে, যাঁরা এই শিল্পকে জনপ্রিয় করে চলেছেন।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও বিভিন্ন বাচিক শিল্পীর শিক্ষায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে বাচিক শিল্প। তাঁদের ভিতর অনেকেই আজ এই শিল্পকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

বর্তমান প্রজন্মের ভিতর বাচিক শিল্পে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের অভিভাবকরাও উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। এটা সংস্কৃতির পক্ষে ভালো লক্ষণ। বর্তমানে পাড়ায় পাড়ায় বাচিক শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক নয়, গ্রামেও এই শিল্পের চর্চা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

এই প্রতিবেদক দেখা করেছিলেন সল্ট লেকের "কথা ও কবিতা"র পরিচালক অনিন্দিতা বসুর সঙ্গে। প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন আবৃত্তি সকলেই ভালোবাসে। কেউ গুণ গুণ করে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য আবৃত্তি করে, কেউ উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে। আবৃত্তি করতে গেলে কণ্ঠের গুরুত্ব অপরিসীম। কণ্ঠ তৈরি করতে হবে। স্পষ্ট উচ্চারণ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে লাইনের শেষ শব্দটির প্রতি— স্পষ্ট উচ্চারণ করতে হবে। কবিতার মর্মে প্রবেশ করতে হবে। কবির বক্তব্যের অন্তর্নিহিত নির্যাস উপলব্ধি করে, প্রকাশ করতে হবে।

"চক্রবর্তী"র কর্ণধার কিংশুক রায় চৌধুরীর সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, বাচিক শিল্পীকে কণ্ঠ তৈরি করতে হলে রেওয়াজের দরকার হয়। দরকার যোগ ব্যায়ামের, ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা ব্যায়াম, আলাদা রেওয়াজের পদ্ধতি। সম্প্রতি এই প্রতিবেদকের সুযোগ হয়েছিল বিভিন্ন সংস্থার আবৃত্তির অনুষ্ঠানে শ্রোতা হিসাবে অংশগ্রহণ করার। যেমন অনিন্দিতা বসুর "কথা ও কবিতা"র জীবনানন্দ সভাঘরের অনুষ্ঠানে, পার্থ মুখোপাধ্যায়ের "সারথি" আয়োজিত বাংলা আকাদেমি মঞ্চের অনুষ্ঠান, অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গান্ধর্ব"র শিশির মঞ্চের অনুষ্ঠান, ডঃ বাসুদেব ভট্টাচার্যের "শেষের কবিতা"র শিশির মঞ্চের অনুষ্ঠান, পূজন ঘোষের দুই বাংলার বাচিক আগর ফেডারেশন হলে এবং কিংশুক রায়চৌধুরীর "চক্রতীর্থ"র শিশির মঞ্চের অনুষ্ঠানে।

এই প্রতিবেদক লক্ষ্য করলেন যে বর্তমান কিশোর-কিশোরীদের প্রচুর উৎসাহ এই ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার। আরও প্রচার এবং প্রসার হোক এই শিল্পের। সংস্কৃতির এই বিভাগ সাধারণের ভিতর আরও জনপ্রিয়তা অর্জন করুক।

শব্দরূপ - ৫১৫

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	১			২	■	৩
৪	৫		■	■		■	
■		■	৬	■	৭	৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০			■
১১		১২	■		■		■
	■		■	■	১৩		
	■	১৪				■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. সংসারে অত্যাসক্ত, ৪. চমরী গুরুর পুচ্ছ নির্মিত ব্যঞ্জনী, ৭. রামানন্দের অন্যতম শিষ্য, এঁর দোঁহা বিখ্যাত, ৯.রাশিচক্রের অষ্টম রাশি, ১০. ছোট নৌকাবিশেষ, ১১. সপত্নী, ১৩. মঠস্বামী, দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী, ১৪. সত্য বা ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও দুঃখবরণ।

উপর-নীচ ঃ ১. বিবাহের পাত্র, আশীর্বাদ, ২. জ্বাল দেবার সময় দুধের উথ্‌লানো, ৩. ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দাসীপুত্র), ৫. বেগুন, ৬. মহাভারতে ভীমের হাতে নিহত রাক্ষস বিশেষ, ৮. বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান, ১০. অর্জুন, ১১. বিভীষণপত্নী, ১২. আনাড়ি, অপটু, ১৩. অজ্ঞান, মূঢ়তা, ভ্রম।

সমাধান শব্দরূপ ৫১৩

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
সত্যেন মন্ডল
নলহাটী, বীরভূম।

■	প	ঞ্চ	মু	খ	■	■	গ্র
সা	ক্ষী	■	■	ড়	■	■	স্থি
■	রা	■	■	ম	হ	র্লো	ক
য	জ	ন	■	■	ং	■	■
■	■	তু	■	■	স	র	যূ
সা	ধু	বা	দ	■	■	ত্না	■
ত্য	■	■	স্ব	■	■	ক	র্ণ
কি	■	■	ল	খি	ন্দ	র	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৭ জুলাই ২০০৯ সংখ্যায়।
শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

চললেন খুড়ো বাঘ ধরতে

শ্যামাপ্রসাদ দাস

মাজায় দড়ি বেঁধে দলবল নিয়ে চললেন খুড়ো বাঘ ধরতে। লোকে মুচকি হেসে বলে — এ বাঘ যে সে বাঘ নয়। লালগড়ের লাল বাঘ। কি মজাদার দৃশ্য।

খুড়ো জঙ্গলে ঢুকলেন। দড়ির এক প্রান্তে বাঁধা খুড়ো, অন্য প্রান্তে ছাগল। তার হাতে বন্দুক। বিশু মামা বলেছেন, দেখিস, সাবধান, বাঘের শরীরে যেন আঁচড়টি না লাগে। বন্দুক শুধু ভয় দেখাবার জন্য। ছাগল চেঁচালেই বাঘ আসবে। তখন ছাগল ছেড়ে দিয়ে বাঘের গলায় দড়ি বেঁধে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নিয়ে আসবি;এটাই নিয়ম। তা না হলেই বাঘ রক্ষা কমিটি ধরে নিয়ে গারদে ঢুকাবে। মনে রাখবি চরিত্রগত দিক থেকে বাঘ মানুষ রাক্ষস এই তিনে মিলে খোক্কস। সবার মধ্যেই কম বেশি দোষগুণ আছে। অতএব মিলেমিশে করি কাজ হারি-জিতি নাহি লাজ। লড়াইটা শুধু দল ভারি করার জন্য। এছাড়া কোনও ভেদ ভাবনা নেই। বাঘ ধরতে সাবধান।

মহা মুশকিলে পড়েছে খুড়ো। এভাবে কী বাঘ ধরা যায়। কিন্তু উপায় নেই, শত হলেও তো লালগড়ের লাল বাঘ। এই বাঘ ধরতে গিয়ে দশ বার পিছিয়ে এসে একবার এগোতে হবে। অতএব সাবধানের মার নেই। চাকুরি বাঁচাতে হলে বিশু মামার হুকুম মেনে চলতে হবে।

এভাবেই দিন যায়, মাস যায় খুড়োর আর বাঘ ধরা হয় না। সেই কবে থেকে দলবল নিয়ে জঙ্গলমহলে বসে আছেন তিনি। এই খুড়োর বাঘধরা কল দেখতে সংবাদের চেয়ে সাংবাদিকের সংখ্যা বেশি। তাই দৈনিক সংবাদপত্রে লালগড়ের সংবাদের আর শেষ নেই।

সম্প্রতি খুড়োর বাঘধরা নিয়ে শুরু হয়েছে এক রাজনৈতিক সমস্যা। কোন দলে কটা বাঘ থাকবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা। এই টানাটানিতে বাঘের অবস্থাও কাহিল। এর সঙ্গে আবার কেন্দ্র-রাজ্য বাদানুবাদ। কেন্দ্র বলছে, বাঘ ধরা থাকবে আমার নিয়ন্ত্রণে। রাজ্য বলছে, আমার রাজ্যের বাঘ ধরার অধিকার আমার। বাঘ বলছে, আমরা সবার। শুধু জঙ্গলমহল আমার। সত্যি, কী মজাদার বাঘবন্দী খেলা। এই খেলায় তাই এখন দলবল নিয়ে খুড়ো বেশ সুখেই আছে জঙ্গলমহলে। এভাবে যতদিন থাকা যায় ততই ভাল। কারণ, মাইনের সঙ্গে জঙ্গল এলাউন্স ও তো কম নয়। তাছাড়া ব্যারাকে বসে কতদিনই বা একঘেয়ে জীবন কাটানো যায়।

এখন আবার বুদ্ধিজীবীদের জঙ্গল রাজা বুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধং দেহি অবস্থা। জঙ্গল রাজা কতিপয় বুদ্ধিজীবীদের বলছেন, আমার হুকুম ছাড়া বাঘবন্দী খেলা দেখতে গেলে কেন? বুদ্ধিজীবীগণ বলছেন, যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই, তাই গিয়েছিলাম সেখানে।

এখন শুধু তর্ক-বিতর্ক দৌড়ঝাপ। নেই কোনও বাঘের লাফঝাপ। খুড়ো এই সব দৃশ্য দেখে বললেন — বাপরে বাপ, এ যে দেখছি বনেদি কুলীন বাঘ। আকাশে মেঘ। বৃষ্টি হচ্ছে ছিটেফোঁটা। গরম কমেছে অনেক। সকলের মাথা ঠান্ডা। বগলে নিয়ে বন্দুক ডান্ডা, চলো, ঘরে ফিরে যাই। জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলে থাক। খুড়োর বুকে স্বস্তির নিশ্বাস। মুচকি হেসে বলে, একেই কি বলে নিষিদ্ধ বাঘ!

ভক্তাধীন ভগবান নিষাদ ভক্ত বাঁকো

(১১ পাতার পর)

ডাকও আছে।

সহাস্যে কামাল বলেন — তাই তো। তোর খ্যাতি আছে। কিন্তু বাবা তোর কর্ম তো ভাল নয়। কি করে বিশ্বাস করি তোকে। সরলমতি বাঁকো এবার উৎকণ্ঠার সুরে বলেন — বাবা আমায় একবার বিশ্বাস করে দেখুন। আমি আপনার বিশ্বাসের লোক হই কিনা।

মুচকি হেসে বলেন কামাল — দেখি তোর তীর-ধনুকটা এবার দে আমায়। দেখি এটাকে।

বাঁকো তুলে দেয় তার রক্তমাখা তীর ধনুক কামাল সাহেবের হাতে। তিনি ধনুকে তীর যোজনা করে বাঁকোর বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করেন। বাঁকো এবার ভয়ে চিৎকার করে ওঠে — বাবা এ কি করছেন। আমার যে প্রাণ চলে যাবে।

হালকা সুরে কামাল বলেন — তাই নাকি। এই নির্দোষ অবলা হরিণকে হত্যার সময় একথা কি তোর মনে ছিল। হরিণের মতো তোমায় যদি হত্যা করি? গভীর উদ্বেগে বলে ওঠে বাঁকো — বাবা আমি সত্যই মহাপাপী। তারপর তাঁর পায়ে পড়ে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কামাল সাহেব তাঁকে উঠিয়ে বুকে চেপে ধরেন। অজ্ঞানী, অবোধ কিরাতের চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়।

সেদিন এক অপূর্ব অনুভূতির আস্বাদ পেল বাঁকো। সংসার ও আত্মীয় পরিজনদের থেকেও সন্ত কামালকে তাঁর অতি আপনজন মনে হয়। অশ্রুঝরা সুরে বলতে থাকে — বাবা, পথে আমাদের মিলন অভাবনীয়। আমি ভাগ্যবান। হৃদয় আমার অপূর্ব অনুরাগ জেগেছে। আমি ঠিক চিনতে পারিনি আপনার মতো সন্তকে। কে আপনি, কোথা থেকে আগমন আপনার?

কাব্যচ্ছলে বললে কামাল — কাশীনগর সে আইয়া, সদগুরু কবীর পাঠায়া। জাহু কামাল জগত হিত, কিয়ো মুলক চেতায়। সদগুরু মেরা কবীর হৈ, মৈঁ সাহিব কা লাল।

তাহলে — তাহলে বাবা আপনি আমার উদ্ধারের জন্য এখানে এসেছেন। আমি এখন আপনার শিকার। এবার আমায় আপনার করে নিন। বালকের মতো রোদন করতে করতে প্রার্থনা করে চলে বাঁকো।

বাঁকোকে মাটি থেকে তুলে বুকে টেনে কামাল সাহেব সস্নেহে বলেন — বাঁকো কতদিন তুমি মিথ্যা মায়ার ফাঁদে থাকবে। জাগতে চাও। এখনি জেগে যাও।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বাঁকো, বলে — বাবা এই বিকট পথে আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আমার একান্ত আশ্রয় এখন আপনি। আশ্বাস দেন কামাল — মানুষের জীবনে এমন মহামূল্য সময় আর আসে না। সন্ত সঙ্গ যখন হয়েছে, এবার পার হয়ে যাও ভব সাগর। সন্তনকা সঙ্গ পায়কে, বেগে চলো উসপার।

সেই মুহূর্তে হরিণের দেহ আর তীর-ধনুক মাটিতে পুঁতে সদগুরু কামালের সাথে বেরিয়ে পড়ে বাঁকো তীর্থ পর্যটনে।

বহু তীর্থ ঘুরে কামাল বাঁকোর সাথে এলেন রাজস্থানের আবু পর্বতের ব্যাস তীর্থে। জনশ্রুতি এই তীর্থে আকাট মূর্খও জ্ঞানী হয়ে যায়। সন্ত কামাল বাঁকোকে এবার বললেন — বাঁকো এখন থেকে হলে তুমি সাধু বাঁকী দাস। জীবকল্যাণ হবে তোমার ব্রত। তুমি এখানে থেকে সাধন-ভজন করো। তুমি সদগুরু-কৃপায় এখন সর্বপাপ মুক্ত। আমি এবার এখান থেকে বিদায় নেব।

গুরু ছেড়ে যাবেন শুনে বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকেন বাঁকীদাস। প্রবোধ দিয়ে সন্ত কামাল বলেন — ভেবো না তোমার সাথে আছে সদগুরুর কৃপা। প্রেমের সাথে ভজন করো। অবশ্যই ভগবৎ দর্শন হবে তোমার। তারপর কাশীতে এসে আমার দর্শন হবে তোমার।

শ্রীহরি ভজনে মগ্ন বাঁকী দাস। মাথায় তৈরি হয়েছে বিশাল জটাভার। পিঙ্গল কেশের মধ্যে শুভ্রতার ঝলক। যুবা শরীরে এসেছে বার্ধক্য। দীর্ঘকাল বাদে শ্রীহরির দর্শনে ধন্য হলেন বাঁকীদাস। গুরু কৃপায় হলেন আপ্তকাম।

এবার গুরুর কথা মনে হল তাঁর। চলে এলেন কাশীতে। একেবারে সদগুরু কবীর দাসের ডেরায়। কক্ষে উচ্চাসনে বসে আছেন সন্ত কবীর দাস। পদপ্রান্তে সেবারত পুত্র তথা শিষ্য কামাল সাহেব।

বাঁকীদাস গুরুকে প্রণাম করতেই আশ্চর্য হলেন তিনি। ঠিক চিনতে পারলেন না জটাজুটধারী বৃদ্ধ বাঁকীদাসকে। বাঁকীদাস অপ্রস্তুত। বললেন বাবা এই ভীলকেই তো আপনি একদিন ব্যাসতীর্থে সাধনায় বসিয়ে এসেছিলেন মনে পড়ে। চিনতে পারেন সন্ত কামাল। বুকে জড়িয়ে ধরেন প্রিয় শিষ্যকে। উভয়ের চোখে তখন অশ্রুধারা। তাঁদের প্রেমালিঙ্গন দেখে আপ্লুত কবীর দাসও।

গুরু কবীর দাসজীকে এবার বলেন কামাল — বাবা আপনি আমায় একবার তিরস্কার করে বলেছিলেন আপনার অধ্যাত্ম শিক্ষাকে আমি নাকি গাজর-মূলোর মতো বাজারে বিক্রি করছি। আমি শুধু এই অজ্ঞানী নিষাদকে কেবল হরিকথা স্মরণ করিয়ে ছিলাম। সেই নিষাদ বাঁকীদাস আজ সিদ্ধ সন্ত রূপে আপনার সামনে।

উল্লসিত কবীরদাস আনন্দের সুরে বললেন — নামামৃত তুমি যাকে পান করিয়েছ, সে তো আজ পরমহংস অবস্থায়। এই মহাভাগ্যবানকে ঈশ্বরের নামরস পেয়ালায় পান করিয়ে মহাধন্য আজ তুমি কামাল।

কাশীতে অবস্থান কালে মহাত্মা বাঁকীদাস স্বরচিত ভজনে সন্তমন্ডলীকে মুগ্ধ করতে লাগলেন। সে ভজনে ছিল সদগুরুর প্রতি প্রেম, ভক্তি ও ব্যাকুলতার রেশ। রচিত হল তাঁর স্বলিখিত সন্তবাণী।

এরপর গুরু আদেশে কাশী ত্যাগ করে শুরু করলেন জগতহিতে যাত্রা। চষে বেড়ালেন গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র অবধি। পান করালেন বহু মানুষকে হরিনাম রস।

বহুদিন পর বাঁকীদাস ফিরে এলেন নিজের সাধনস্থলী ব্যাসতীর্থে। সেখানে ধ্যানাবস্থায় বিলীন হলেন প্রভুপাদ চিরকালের জন্য। সদগুরুর কৃপার কথা তাঁর বাণীতে ভাস্বর হয়ে উঠত। বলতেন —

সুকৃত অগলে জনমকে, ভেটয়া সন্ত কামাল।

বিকট য়হী সংসার মেঁ, বাঁকীদাস হুয়ে ন্যাল।।

অসামাজিক কার্যকলাপের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠছে রেলবস্তি কলোনীগুলো

অনুপ নাথ ঃ ব্যারাকপুর ।। বামফ্রন্ট সরকারের আশীর্বাদে 'পোওয়া বারো' সদ্য ওপার বাংলা থেকে আসা বাসিন্দাদের। উত্তর ২৪ পরগণার বেনাপোল, পেট্রাপোল ও নদীয়ার গেদে সীমান্ত থেকে দালাল মারফত এদেশে ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশীরা। এদের বেশিরভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এপারে এসে রেল কলোনীর বস্তিগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছেন ওরা, শাসকদলের দাদাদের পকেট ভর্তি করে অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছে এখানে 'চিরস্থায়ী' বসবাসের ছাড়পত্র। মিলছে রেশন কার্ড ও ভোটারকার্ডও। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক বাড়াতে দু-আনা, চারআনা খ্যাত শাসকদলের নেতারা ঘুর ঘুর করেন ওই সব বস্তি অঞ্চলে, মাঝে মধ্যেই মেলে প্রণামীও। ওই রকম বেশ কিছু রেল কলোনীতে ক্রমশ সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। অসামাজিক কার্যকলাপের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে বলে স্থানীয় মানুষজন অভিযোগ করছেন। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর শাখায় জগদ্দল ও শ্যামনগর রেলকলোনী শাসকদলের মদতপুষ্ট নেতাদের মদতে গড়ে উঠেছে বহু বছর আগে। আর ওই সকল অঞ্চলে ভিড় জমাচ্ছে ওপার বাংলা থেকে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ফরওয়ার্ড ব্লকের নেত্রী ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, শ্যামনগর ১ নম্বর ও ৪ নম্বর লাইনপাড়ের বস্তিতে রাতের অন্ধকারে সমাজবিরোধীরা আস্তানা গাড়ছে। মধুচক্র থেকে শুরু করে নারী পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত পান্ডাদের অবাধ মেলামেশা রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কিছু মস্তান ও বিশেষ রাজনৈতিক দলের মদত থাকায় প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস পান না। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকবার দুস্কৃতীদের পাকড়াও করেছে। প্রশাসন ঠিকমতো নজর না দিলে শ্যামনগর অঞ্চলে আগামী দিনে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অন্যদিকে আজ থেকে ২০ বছর আগে শাসকদলের মদতেই গড়ে ওঠে জগদ্দল রেলবস্তি কলোনী। এক সিপিএম নেতার আশ্রয়েই এলাকায় 'ডন' হয়ে ওঠে বস্তির ত্রাস লিটন, ছোটন, বাপির সাঙ্গোপাঙ্গোরা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, নতুন জায়গা কিনে বাড়ি তৈরিতে বাধা দেয় ওরা, কিন্তু 'তোলা' মিললে সব মকুব। সন্ধ্যা নামতেই চলে মদ-গাঁজা-হেরোইনের রমরমা ঠেক। কখনও বটবৃক্ষের তলায়, কখনও ভেড়ির পাড়ে। কিন্তু প্রশাসন জেনে শুনেও নির্বিকার। কয়েক বছর আগে বোমা বাঁধতে গিয়ে জখম হয়েছিল লিটনের দলবল, বেশ কিছুদিন জেলের ঘানি টেনে, ফের এলাকায় দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। কিছুদিন আগে এক বিধবা ও তার ছেলেকে বেধড়ক পেটায় বস্তির মস্তান লিটন। কিন্তু প্রাণের ভয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে সাহস পায়নি ওই অসহায় পরিবার। বাধ্য হয়ে রেলবস্তি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এছাড়া রেলবস্তি লাগোয়া পূর্বাশা পাড়ার আরও একটি পরিবারকে এলাকা ছাড়া করেছে লিটন ও বাপিদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা। ওই পরিবারেও প্রাণের ভয়ে বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেছে বলে বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, ক্রমশ জগদ্দল স্টেশন চত্বরে দেহপসারিনীদের-বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠছে। আর এদের মদত জোগাচ্ছে বস্তিরই বাসিন্দারা।

তবে জগদ্দল ও শ্যামনগর স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি করায় আজ অনেকটাই নিরাপদ বলে নৈহাটি জি আর পি জানিয়েছে। এদিন ভাটপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক অর্জুন সিং-এর সাফ জবাব, ক্রিমিনাল ক্রিমিনালই, সমাজবিরোধীরা যে দলেরই হোক না কেন, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করুক। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, কাদের মদতে এদের দৌরাত্ম্য? রাজনৈতিক নেতারা কি এই দায় এড়াতে পারেন?

Swastika
13 July - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

কলকাতায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী

ভারতের চিন্তাধারাই আজ বিশ্বে গ্রহণযোগ্য বিকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। 'রাষ্ট্রবাদ বা জাতীয়তাবাদ যখন দেশবাসীর মনে প্রবল হয় তখনই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি পরাজিত হয়। এটা করে দেখিয়েছিলেন বাংলার মানুষ। বাংলাকে ভাগ করার ষড়যন্ত্র সফল করতে লর্ড কার্জন বিফল হন। বাংলার আলোতে আলোকিত ভারত। সেই বাংলাতে এখন এমন এক দল ক্ষমতায় যারা ধর্মকে আফিম বলে মনে করে, জাতীয়তাবাদের কথা যাদের অভিধানে নেই। দেশকে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিতে হলে সেই রাষ্ট্রবাদ বা জাতীয়তাবাদই একমাত্র বিকল্প। এই জাতীয়তাবাদকে অধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রদান করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা। এই ধারা থেকে উদ্ভুত হয়েছেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন, প্রকৃত রাষ্ট্রপুরুষ'। উপরের কথাগুলি বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ সুরেশ সোনী। গত ৬ জুলাই সন্ধ্যায় কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট সভাগারে দিল্লীর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউণ্ডেশন এবং কলকাতার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতি ও অন্য অনেকগুলি জাতীয়তাবাদী সংস্থার আয়োজিত এক সভায় তিনি এই কথাগুলি বলেন। শ্রী যোশী বলেন, শ্যামাপ্রসাদ জীবন বাজী রেখে বলেছিলেন, এক দেশ মেঁ দো নিশান, এক দেশ মেঁ দো প্রধান, এক দেশ মেঁ দো বিধান -- নেহি চলেগা, নেহি চলেগা। তাঁর বলিদানের ফলেই জম্মু-কাশ্মীরের সদর এ রিয়াসৎ হয় গভর্ণর এবং উজীর-এ আজম হন মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতায় ১০৮তম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তরুণ বিজয়, সুরেশ সোনী, জেঃ শঙ্কর রায়চৌধুরী, শিবরাজ সিং চৌহান ও অন্যান্যরা।

শ্রী সোনী আরও বলেন, রাষ্ট্রবাদ বা জাতীয়তাবাদ — তাকে ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব যাই বলা হোক না কেন, তাকে পুনরায় জাগ্রত করার একান্ত আবশ্যকতা রয়েছে। ভারতের চিন্তাধারা, আদর্শই আজ পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য বিকল্প। কয়েক বছর আগে পৃথ্বী সম্মেলনে আমেরিকার তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি আল গোরে বলেছিলেন, 'আমরা গত ৩০০ বছর ভুলপথে চলেছি। ভারত থেকে সংযমের শিক্ষা না নিলে ভারত আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাবে।' রাশিয়া টুকরো টুকরো হওয়া থেকে রক্ষা পেতে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ভারতের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার কথা বলেছিলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি গর্বাচভকে। শ্রী সোনী বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো জীবন বাজি রেখে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হলে ভারতের ভাগ্যসূর্য পুনরায় উদিত হবে।

এদিন সভার বিশেষ অতিথি ছিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেন, আজও ভারতের কাছে যেটুকু কাশ্মীর রয়েছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর। তিনিই পাকিস্তানকে ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাব ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। হিন্দুত্বের চিন্তাধারা কোনও সংকীর্ণ বা সাম্প্রদায়িক নয়। কেননা হিন্দুরাই বলে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', একম্ সদ্, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ....। এদিনের সভায় সভাপতি ছিলেন ভারতের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সেনাপতি জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সমস্যা দূর করতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশিত পথ গ্রহণ করতে হবে।

সভা পরিচালনা করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর তরুণ বিজয় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি সত্যব্রত মুখার্জী।

এদিন এই সভায় স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'জাতীয়তাবাদই জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে' শীর্ষক এক বাগ্মীতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৫২ জন প্রতিযোগীর সকলকে শংসাপত্র ও আট জনকে নগদ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রতিযোগীদের সঙ্গে শিবরাজ সিং চৌহান ও জেঃ শঙ্কর রায়চৌধুরী।

বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে উনত্রিশ হাজার একল বিদ্যালয় চলছে

বাসুদেব পাল।। 'দান করলে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। অপরের দুঃখ কষ্ট দূর করলে অন্তরে আনন্দ অনুভব হয়। আমরা তো সরকারি সহায়তা ছাড়াই সমাজের সহযোগিতায় 'বনবন্ধু পরিষদে'র উদ্যোগে একল বিদ্যালয়ের কাজ করছি। গত ২৮ জুন সকালে কলকাতার বিড়লা সভাগারে এই কথাগুলি বলেন 'বনবন্ধু পরিষদ'-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সজ্জন ভজনকা। এদিন বনবন্ধু পরিষদের কলকাতা শাখার বার্ষিক উৎসবে তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের আমেরিকার ধনকুবের ও মাইক্রোসফট্ কোম্পানীর মালিক বিল গেটস্-এর উদাহরণ গ্রহণ করা উচিৎ। বিল গেটস্ তাঁর বিপুল সম্পত্তির দশ হাজার ভাগের এক ভাগ ছেলে-মেয়েদের জন্য রেখে বাকী পুরোটাই মিরান্দা ফাউণ্ডেশনকে অর্পণ করেছেন। সেজন্য তাঁর কোনও অসুবিধাই হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারা ভারতে বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে বনবাসী এলাকায় ২৯ হাজার একল বিদ্যালয় (One Teacher School) চলছে।

মঞ্চে বাঁ দিক থেকে প্রকাশ চণ্ডালিয়া, তরুণ বিজয়, নন্দলাল রুংটা ও সজ্জন ভজনকা।

এদিনকার বার্ষিক উৎসবে প্রধান বক্তা ছিলেন দিল্লীর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক তরুণ বিজয়। তিনি বলেন, লালগড়ে যদি একল বিদ্যালয়ের কাজ চলত তাহলে এতবড় ঘটনা ঘটত না। ওখানে বনবাসী জনজাতিরা উন্নয়ণের ছোঁওয়া থেকে বঞ্চিত। সেজন্য তাদের মনে সরকার বিরোধী ক্ষোভ জমাটা স্বাভাবিক। তরুণজী এজন্য পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের অপদার্থতাকেই দায়ী করেন। শ্রীতরুণ বিজয় আরও বলেন, একল বিদ্যালয়ের কাজ হল শ্রীরামচরিতমানস-এর ফলিত স্বরূপ যা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘরূপী গঙ্গাপ্রবাহ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এদিন সভার প্রধান অতিথি ছিলেন ঝাড়খন্ডের চাইবাসার নন্দলাল রুংটা। তিনি অখিল ভারতীয় মারোয়াড়ি সম্মেলনের সভাপতি এবং ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি। বনবন্ধু পরিষদের কাজে তিনি সবাইকে সহভাগী হওয়ার আহ্বান জানান। সভার অব্যবহিত পরেই প্রায় দেড় ঘন্টা মনোমুগ্ধকর নৃত্য-গীতি আলেখ্য মঞ্চস্থ হয়। মুম্বই-এর প্রসিদ্ধ গায়ক ও সুরকার রাজেন্দ্র জৈন-এর পরিবেশিত হয় 'কব আওগে রাম'। এদিন সভার শুরুতে বনবন্ধু পরিষদের কাজ সম্বন্ধে বিবরণ দেন পরিষদের কলকাতা শাখার সভাপতি ধর্মচন্দ্র আগরওয়াল। সভার শেষে ধন্যবাদ জানান আহ্বায়ক সুভাষ মুরারকা। সভা পরিচালনা করেন প্রকাশ চন্ডালিয়া।

বর্তমানে বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে দেশ জুড়ে পরিচালিত একল বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯ হাজার। এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। ২০১১-র মধ্যে দেশের ১ লক্ষ গ্রামে একল বিদ্যালয় স্থাপন ও ১৫টি বড় কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা এদিন ঘোষণা করা হয়।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com